উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। ২০২১-এ এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে "এ" গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে এবং ২০২৪-এ সমগ্র দেশের মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাক্ষেত্রে NIRF মূল্যায়নে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। পাশাপাশি, ২০২৪-এই 12B-র অনুমোদন প্রাপ্তি ঘটেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP, ২০২০)-র নির্দেশনামায় সিবিসিএস পাঠক্রম পদ্ধতির পরিমার্জন ঘটানো হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes (CCFUP)-এ চার বছরের স্নাতক শিক্ষাক্রমকে ছ'টি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল- "কোর কোর্স", "ইলেকটিভ কোর্স", 'মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স' "স্কিল এনহান্সমেন্ট কোর্স", "এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স" এবং ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স। ক্রেডিট পদ্ধতির ভিত্তিতে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। জাতীয় শিক্ষানীতি পরিমাণগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি গুণগত মানের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) এবং National Skills Qualification Framework (NSQF)-এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চার বছরের স্নাতক পাঠক্রম প্রস্তুতির দিশা দেখিয়েছে। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক, যা অবিচ্ছিন্ন ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মাধ্যমে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে অগ্রসর হবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য। উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি-র জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ি
উপাচার্য

Netaji Subhas Open University

Four Year Undergraduate Degree Programme

Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) &

Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes

Bachelor of Commerce (Honours) Commerce (NCO)

Course Type : Discipline Specific Elective (DSE)

Course Title : বিপনন ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা

Marketing and Human Resource Management

Course Code : NEC-MG-02

প্রথম মুদ্রণ : মার্চ, 2025

Memo No. : SC/DTP/478 Dated : 09.01.2025

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

Netaji Subhas Open University

Four Year Undergraduate Degree Programme
Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) &
Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes
Bachelor of Commerce (Honours) Commerce (NCO)
Course Type : Discipline Specific Elective (DSE)
Course Title : বিপনন ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা
Marketing and Human Resource Management
Course Code : NEC-MG-02

: বিষয় সমিতি :

সদস্যবৃন্দ

ড. অনির্বাণ ঘোষ
(Chairperson)
Professor of Commerce, NSOU

ড. সজল কুমার মাইতি
Professor of Commerce (PG Deptt.)
Goenka College of Commerce
Business Administration

সি.এ. শুভায়ন বসু
Former Associate Professor of Commerce
Ananda Mohan College

ড. বিশ্বজিৎ ভদ্র
Associate Professor, NSOU

ড. উত্তম কুমার দত্ত
Professor of Commerce
NSOU

ড. চিত্তরঞ্জন সরকার
Professor of Commerce
NSOU

ড. আশিস কুমার সানা
Professor of Commerce
University of Calcutta

ড. সুদর্শন রায়
Asstt. Professor of Commerce
NSOU

: রচনা :

ড. বিশ্বজিৎ ভদ্র
Associate Professor, NSOU

: সম্পাদনা :

ড. অনির্বাণ ঘোষ
Professor of Commerce, NSOU

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ উপকরণের সমুদায় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যাতিরেকে এই পাঠ উপকরণের কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা পুনরুৎপাদন এবং কোনো রকম উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ বে-আইনি ও নিষিদ্ধ। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় বিধিসম্মত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

অনন্যা মিত্র
অতিরিক্ত ভারপ্রাপ্ত নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ফাইকোলজি ও মাইক্রোবায়োলজি
6CC-BT-05

পর্যায় : I

একক - 1 ❑ বিপণন ও মানব-সম্পদ ব্যবস্থাপন (Marketing and Human Resource Management) 7-24

একক - 2 ❑ বাজার বিভাজন (Market Segmentation) 25-39

একক - 3 ❑ পণ্য ও পণ্যের দাম (Product and Pricing of Product) 40-56

একক - 4 ❑ বিপণন প্রসার (Marketing Promotion) 57-72

একক - 5 ❑ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা (Human Resource Management) মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা (Concept of Human Resource Management) 73-85

পর্যায় : II

একক - 6 ❑ মানবসম্পদ পরিকল্পনা, কর্মী-সংগ্রহ এবং নির্বাচন (Human Resource Planning, Recruitment and Selection) 86-104

একক - 7 ❑ প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়ন (Training and Development) 105-120

একক - 8 ❑ কর্ম মূল্যায়ন এবং কার্য সম্পাদন পর্যালোচনা (Job Evaluation and Performance Appraisal) 121-134

বিপণন ও মানব-সম্পদ ব্যবস্থাপন
(Marketing and Human Resource Management)

একক ১ ❑ বিপণন সম্পর্কে ধারণা (Marketing Concepts)

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য
১.২ প্রস্তাবনা
১.৩ বিপণনের উৎপত্তি ও উন্নয়ন
১.৪ বিপণনের অর্থ
১.৫ বিপণনের বৈশিষ্ট্য
১.৬ বিপণনের উদ্দেশ্য
১.৭ বিপণনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
১.৮ বিপণনের মৌলিক কার্যাবলি
১.৯ বিপণন মিশ্রণ ও বিপণন মিশ্রণের উপাদানসমূহ
১.১০ সারাংশ
১.১১ অনুশীলনী

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি থেকে আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবহিত হবেন—

- বিপণনের উৎপত্তি ও উন্নয়ন
- বিপণনের বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য
- বিপণনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
- বিপণনের মৌলিক কার্যাবলি
- বিপণন মিশ্রণ

১.২ প্রস্তাবনা

উচ্চ প্রযুক্তির যুগে আমরা সকলেই প্রতিদিন নানাভাবে বিপণনের সান্নিধ্যে আসি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপেই বিপণন কোনো-না-কোনোভাবে জড়িয়ে থাকে এবং আমাদের চাহিদা মেটায়। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে বিনিময় ধারণার উপর বিপণন গড়ে উঠেছে। এ যাবৎ বিপণনের যে সব অভিমুখ দেখা গেছে সেগুলি হল উৎপাদনমুখী, বিক্রয়মুখী, পণ্যমুখী, বিপণনমুখী, ক্রেতামুখী, সমাজমুখী ইত্যাদি। বর্তমান বিপণন যে মূল তিনটি স্তম্ভের উপর গড়ে উঠেছে সেগুলি হল গণমাধ্যম, গণবাজার ও গণসংযোগ। এর সাথে যুক্ত হয়েছে সম্পর্কভিত্তিক বিপণন ও বাস্তব সময়ভিত্তিক বিপণন এবং যার ফলে বিপণন কার্যকলাপের মধ্যে এক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। বিপণনের মাধ্যমে ক্রেতার সন্তুষ্টি ও প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য কীভাবে পূরণ করা সম্ভব তা এই একক থেকে ধারণা পাওয়া যাবে।

১.৩ বিপণনের উৎপত্তি ও উন্নয়ন (Origin and growth of marketing)

বিনিময় ধারণার উপর বিপণন গড়ে উঠেছে। এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হল ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রয়োজন মেটানোর প্রচেষ্টা, পণ্যের মালিকানার হস্তান্তর ও বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা। অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরনের বিনিময় কার্যকলাপের উদ্ভব ঘটেছে। **প্রাক্-শিল্প** যুগে (Pre-Industrial period) **'পণ্যের বিনিময়ে পণ্য'** প্রথা (barter system) চালু ছিল। অবশ্য ওই যুগেই 'পণ্য বা দ্রব্যের বিনিময়ে পণ্য বা দ্রব্য' পদ্ধতির অসুবিধা দূর করার জন্য মুদ্রা ব্যবস্থার সূচনা হয়। **শিল্প অর্থনীতির উন্নয়ন যুগে** (Industrial economic development stage) গণ-উৎপাদন, পণ্যের প্রমিতকরণ এবং নৈর্ব্যক্তিক বিনিময় প্রথার উদ্ভব ঘটে। **শিল্প যুগের পরবর্তী** (Post-industrial phase) সময়ে সেবা এবং ধারণা বিনিময়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

এ যাবৎ বিপণনের বিভিন্ন অভিমুখ দেখা গিয়েছে। এগুলি হল **উৎপাদনমুখী, বিক্রয়মুখী, পণ্যমুখী, বিপণনমুখী, ক্রেতামুখী, সমাজমুখী** ইত্যাদি। বিগত শতকের প্রথমার্ধে উৎপাদনের উপর অধিক জোর দেওয়া হয়েছিল। 1930 সাল নাগাদ জোর দেওয়া হয় বিক্রয়ের উপর। ফলে **বিক্রয়মুখী বিপণনের** উদ্ভব ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে বাজারে চাহিদার থেকে যোগান বৃদ্ধি পেতে থাকে। পণ্য বিক্রয়ের জন্য কোম্পানিগুলি **ঠেলা কৌশল** (Push strategy) অবলম্বন করতে থাকে। এর ফলে বিক্রয় প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পুনঃপুনঃ বিক্রয় দর্শন গড়ে উঠে। এর পিছনে যে দুটি প্রধান কারণ বর্তমান ছিল সেগুলি হল—ক্রেতার আচরণ সংক্রান্ত গবেষণার বিশেষ উন্নয়ন না ঘটা এবং বিপণন সংস্থাগুলির মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব। এর পরবর্তীকালে উৎপাদকরা ক্রেতাদের প্রয়োজন জানার জন্য বাজার গবেষণা শুরু করে। 50-এর দশকের শুরুর দিকে **বিপণন ধারণার** প্রবর্তন ঘটে। এই

ধারণায় বলা হয় যে পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে সাফল্য পেতে হলে বিপণনকারীদের অবশ্যই ক্রেতাদের পছন্দ-অপছন্দ, প্রয়োজন ইত্যাদি জানতে হবে এবং উপযুক্ত বিপণন কৌশল গ্রহণ করতে হবে। এই সময় থেকে ক্রেতাদের আচরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং পণ্যের **অভিজ্ঞাতকরণ** বা **নামকরণ** (Branding)-এর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। বিপণনের ক্ষেত্রে গবেষণার প্রচলনের সাথে সাথে মনোবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, নৃতত্ত্ববিদ্যা, পরিসংখ্যানবিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত তত্ত্ব বিপণনে প্রয়োগ হতে থাকে। বিগত শতকের পঞ্চাশের দশকে বিপণনের ক্ষেত্রে **আচরণগত বিজ্ঞানের** (behavioural science) উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রথমে ক্রেতাদের আচরণে আবেগ ও যুক্তির প্রভাব কতখানি তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। তারপর ক্রেতাদের আচরণের উপর **সামাজিক প্রভাবের** গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল। সবশেষে **পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের** (household decision making) বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

ষাটের দশকে ব্র্যান্ড আনুগত্য গড়ে তোলার (development of brand loyalty) উপর জোর দেওয়া হয়েছিল এবং ক্রেতাদের ক্রয় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ব্র্যান্ডের প্রভাব নির্ধারণ করার জন্য বিভিন্ন পরিসংখ্যান মডেল, যেমন **স্কলাস্টিক মডেল** (scholastic model), **ইকনোমেট্রিক মডেল** (Econometric model) ইত্যাদির ব্যবহার শুরু হয়। এই দশকে যেসব পরিবর্তন ঘটেছিল সেগুলি হল—

(ক) ক্রেতাদের আচরণ সংক্রান্ত গবেষণার উপর গুরুত্বদান।

(খ) বেশি করে ক্রেতামুখী বিপণন কৌশলের প্রয়োগ।

(গ) যেসব বিষয় ক্রেতাদের আচরণকে প্রভাবিত করে সেগুলি পরিমাপ করার ক্ষেত্রে উন্নয়ন।

(ঘ) বাজার বিভক্তিকরণের (market segmentation) উপর গুরুত্ব প্রদান।

(ঙ) বাজারে পণ্যের অবস্থানের (product positioning) উপর গুরুত্ব আরোপ করা।

(চ) প্রসার বা প্রবর্তন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে মৌলিকত্ব বজায় রাখার উপর জোর দেওয়া।

(ছ) নির্বাচিত বিজ্ঞাপন মাধ্যম ও বণ্টন প্রণালীর উপর নির্ভরতা।

সত্তরের দশকে বিপণনের কেন্দ্রবিন্দু আবার পরিবর্তিত হয় এবং **শিল্প ও প্রতিষ্ঠানের ক্রয় আচরণের** উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হতে থাকে। এর ফলে ক্রেতার 'দৃষ্টিভঙ্গি-আচরণ সম্পর্কের' (attitude-behaviour relationship) উদ্ভব ঘটে। এই সময়েই পণ্যের ব্র্যান্ডের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বলা হয় যে ক্রেতার ভবিষ্যৎ আচরণকে ব্র্যান্ড অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত করে।

বিপণনের বিক্রয়মুখী ধারণা থেকে ক্রেতামুখী ধারণায় পরিবর্তিত হতে প্রায় তিন দশক সময় লেগেছিল। **আশির দশকের** মাঝামাঝি সময়ে **পণ্যের গুণমান** (quality) ও **উপযোগিতা** (utility) বিপণন কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। অর্থাৎ পণ্যের মধ্যে আরও বেশি উপযোগিতা (utility) যোগ করার উপর বিপণনকারীরা গুরুত্ব দিতে থাকে।

আশির দশকে বিপণন গবেষণার ক্ষেত্রেও নানা ধরনের অগ্রগতি ঘটেছিল। এই দশকেই ‘সেবা-বিপণন’ (Service marketing) আলাদাভাবে গুরুত্ব পায়। এছাড়াও বিপণনের সামাজিক দায়িত্ব ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলিও গুরুত্ব পেতে থাকে।

নব্বইয়ের দশকে ‘শিল্পগত’ ও **‘কারবার থেকে কারবার’** ('business-to-business') বিপণনের উপর জোর দেওয়া হয়। কারবার থেকে কারবার বিপণন ধারণাকে **'B2B'** নামে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ এই দশকে পণ্যের যোগান সমেত বিপণন অর্থাৎ কাঁচামাল থেকে চূড়ান্ত ভোগকারী পর্যন্ত যেসব কার্যকলাপ গ্রহণ করা হয় এই সমস্তগুলিকে নিয়েই বিপণনকে দেখার চেষ্টা করা হয়। এই দশকের শেষ দিকে বিপণনের ক্ষেত্রে আর একটি নতুন ধারণার উদ্ভব হয় যাকে **‘সম্পর্কভিত্তিক বিপণন’** (relationship marketing) বলা হয়।

আশির দশক পর্যন্ত বিপণন কাঠামো মূলত তিনটি স্তম্ভের উপর গড়ে উঠেছিল। এগুলি হল **গণমাধ্যম** (mass media), **গণবাজার** (mass market) ও **গণসংযোগ** (mass communication)। কিন্তু বিগত শতকের শেষ দিকে এই কাঠামোটি ভাঙতে শুরু করে। গণমাধ্যম বহুধাবিভক্ত (fragmented) হয়ে পড়ে, গণ সংযোগ ব্যষ্টি বা ক্ষুদ্রায়তন বিপণনের উদ্ভব ঘটায়। বিভিন্ন মাধ্যম (যেমন—টেলিভিসন) তথ্য ভাণ্ডার ব্যবহার করে ক্রেতাদের আরও ভালোভাবে তথ্য জানাতে সক্ষম হয়। বর্তমানে কেবল্ টিভির দৌলতে নানা ধরনের চ্যানেল বিভিন্ন ধরনের ক্রেতার উদ্দেশ্যে তাদের অনুষ্ঠান প্রচার করে। **সম্পর্কভিত্তিক বিপণন** (relationship marketing) ও **বাস্তব সময়ভিত্তিক বিপণন** (real time marketing)-এর উদ্ভবের সাথে সাথে বিপণন কার্যকলাপের মধ্যে এক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। **সম্পর্কভিত্তিক বিপণনকে** 80/20 নিয়ম (80/20 rule) ও বলা হয়। অন্যদিকে **বাস্তব সময়ভিত্তিক বিপণনকে** কথোপকথনের কলা (art of dialogue) বলা হয়। বস্তুত গত শতাব্দীর শেষ দিকে বিপণন পণ্যের গুণগত মানের উপর জোর দিতে শুরু করে (quality players)। বিপণন আরও আধুনিক, জটিল এবং ছোটো পরিধির ক্রেতাদের দিকে লক্ষ্য রেখে গড়ে উঠতে শুরু করে। বহুমাধ্যম (multimedia) প্রযুক্তি, নতুন বণ্টন প্রণালী, ক্রেতামুখী বিপণনের উন্নয়ন বিপণনে নানাধরনের পরিবর্তন সূচিত করে। পণ্য সেবা হিসাবে এবং সেবা পণ্য হিসাবে গণ্য হতে থাকে। আর এসব পরিবর্তন ‘সংকট ব্যবস্থাপনা’ (Crisis management) এবং ‘সামাজিক বিপণনের’ (Social marketing) মতো উপবিভাগের উদ্ভব ঘটিয়েছে। এভাবে বিগত শতকে বিপণন বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধি লাভ করেছে এবং একুশ শতকে তথা নতুন সহস্রাব্দে প্রবেশ করেছে।

১.৪ বিপণনের অর্থ (Meaning of Marketing)

ব্যুৎপত্তিগতভাবে বিপণন কথাটি বিপণি থেকে এসেছে। সেকারণে বিপণনকে বিপণিজাতকরণও বলা যায়। আবার, বিপণির অপর অর্থ হল দোকান বা বাজার অর্থাৎ যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতা

মিলিত হয় ও পণ্য বা সেবার বিনিময় ঘটে। বাজারে ক্রেতা তার পছন্দসই জিনিস বিপণি থেকে ক্রয় করে নিজের চাহিদা মেটায়। সুতরাং বিপণির মাধ্যমে পণ্য বা সেবার **বিনিময়** (exchange) ঘটে বলেই **বিপণন** শব্দটির উদ্ভব হয়েছে বলে মনে করা হয়।

আবার ইংরেজি শব্দ 'Marketing'-এর মূল শব্দ হল 'Market' যার আভিধানিক অর্থ হল 'বাজার'। সুতরাং marketing বলতে পণ্য বা সেবার বাজারিকরণ বা বাজারজাতকরণও বোঝায়। সাধারণভাবে বাজার বলতে বোঝায় যেখানে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয় অর্থাৎ পণ্য বা সেবার বিনিময় ঘটে ও লেনদেন সংঘটিত হয়। কিন্তু বিপণনের এই অর্থ সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে market বলতে বোঝায় যেখানে ক্রেতারা তাদের চাহিদা ও প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী বস্তুর সন্ধান করে, ক্রয় করে ও এসবের মাধ্যমে চাহিদা পূরণ করে ও তৃপ্ত হয়। সুতরাং marketing শব্দটি এদিক থেকে বিচার করলে বোঝায় ক্রেতাদের চাহিদা ও প্রয়োজন মেটানোর জন্য এবং তাদের সন্তুষ্ট করার উপযোগী বস্তুর বাজারে যোগান দেওয়ার আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা। ক্রেতাদের তৃপ্তি পণ্য বা সেবার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যেমন—গুণগত মান, পরিমাণ, আকার, দাম, উপযোগিতা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। বিপণন এই সমস্ত বিষয়ের উপর যথাযথ গুরুত্ব দেয় ও পণ্যকে ক্রেতাদের ভোগের জন্য বাজারে উপস্থাপিত করে।

বিভিন্ন ব্যবস্থাপনাবিদ বিপণনের যেসব সংজ্ঞা দিয়েছেন তার কয়েকটি নীচে তুলে ধরা হল।

ব্যবস্থাপনাগতভাবে বিপণন হল 'পণ্য বিক্রয়ের কলা' (...the art of selling products)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিপণন বিক্রয় নয়। বিক্রয় হল বিপণন নামক হিমশৈলের চূড়ামাত্র।

American Marketing Association প্রদত্ত এক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—**'বিপণন হল সেই সকল ব্যবসায়িক কার্যকলাপ, যা পণ্য বা সেবাকে উৎপাদকের কাছ থেকে ভোক্তার কাছে নিয়ে যায়।'**

এই সমিতি 1985 সালে বিপণনের আর একটি সংজ্ঞা প্রকাশ করে যা আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত। এই সংজ্ঞানুযায়ী 'বিপণন হল পণ্য, সেবা বা ধারণার পরিকল্পনা ও রূপায়ণ, দাম নির্ধারণ, বিক্রয় সম্প্রসারও ও বণ্টন সংক্রান্ত প্রক্রিয়া যার ফলে বিনিময়ের উদ্ভব হয় এবং ক্রেতার সন্তুষ্টি ও প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য পূরণ সম্ভব হয়।'

Philip Kotler খুব সংক্ষিপ্ত ও সুন্দরভাবে বিপণনের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন **'যেসব মানবিক কার্যকলাপ বিনিময় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে কাজ করে তাই হল বিপণন।'**

F. E. Clark ও **C. P. Clark** তাঁদের সংজ্ঞায় পণ্যের মালিকানার পরিবর্তন ও ভৌত বণ্টনের দিকটি তুলে ধরেছেন। তাঁরা বলেছেন—**'যে সব কর্মপ্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হল পণ্যের মালিকানার হস্তান্তর ও যেসব উদ্যোগ পণ্যের ভৌত বণ্টনের প্রতি যত্নবান, তাদেরকেই একত্রে বিপণন বলা হয়।'**

বিপণনের উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলি পর্যালোচনা করলে আমরা বিপণনের যে ধারণা পাই তা হল—

1. বিপণন ক্রেতাদের প্রয়োজন, চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি নির্ধারণ করে;
2. ক্রেতাদের চাহিদা ও প্রয়োজন মেটানোর জন্য পণ্য বা সেবার পরিকল্পনা করে;
3. পণ্যের মোড়কবন্ধন, অভিজ্ঞাতকরণ, দাম নির্ধারণ ও বিক্রয় সম্প্রসারণের কাজ করে;
4. পণ্যের বিনিময় তথা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে;
5. বিক্রয় ও বিক্রয় পরবর্তী সেবার মাধ্যমে ক্রেতাদের সন্তুষ্টিবিধান করে;
6. এসব কার্যকলাপের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে; এবং
7. সর্বোপরি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করে।

রেখাচিত্রের মাধ্যমে বিপণনকে তুলে ধরলে যে চিত্র পাওয়া যায় তা হল—

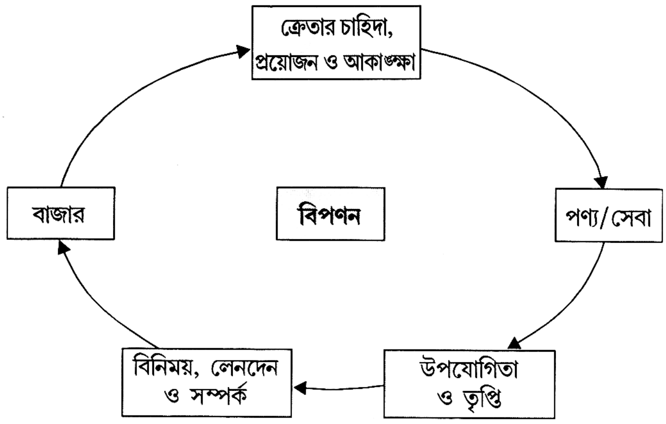

১.৫ বিপণনের বৈশিষ্ট্য (Features of Marketing)

বিপণন হল একটি প্রক্রিয়া যা পণ্য বা সেবার প্রবাহকে উৎপাদকের কাছ থেকে চূড়ান্ত ভোগকারীদের কাছে পৌঁছে দিয়ে তাদের চাহিদা মেটায় ও কারবারে মুনাফার সৃষ্টি করে। এভাবে বিপণন ক্রেতা ও কারবার উভয়েরই উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয়। পণ্যকে বিক্রয়যোগ্য করা ও বিনিময়ের মাধ্যমে ক্রেতাদের সন্তুষ্ট করার সকল কাজ বিপণনের অন্তর্গত। বিপণনের বৈশিষ্ট্যগুলিকে মূলত দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়—(ক) **অর্থনৈতিক** (Economic) দিক ও (খ) **তন্ত্রগত ধারণার** (System approach) দিক।

(ক) **অর্থনৈতিক দিক** থেকে বিপণনের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

1. **উপযোগিতা** (Utility) : ক্রেতার চাহিদা পূরণের জন্যই পণ্যের বিপণন দরকার। সুতরাং পণ্যটিকে ক্রেতার চাহিদা পূরণের উপযোগী করে গড়ে তোলা বিপণনের একটি প্রধান

বৈশিষ্ট্য। পণ্য বা সেবার উপযোগিতা না থাকলে, বিপণন সম্ভব হয় না। কারণ ক্রেতারা পণ্য কেনে না, পণ্যের উপযোগিতা কেনে। আর পণ্যের উপযোগিতা হল ক্রেতার অভাব বা চাহিদা পূরণের ক্ষমতা।

2. **চাহিদা পূরণ** (Satisfying demand) : ক্রেতার চাহিদাকে কেন্দ্র করেই বিপণনের কাজকর্ম পরিচালিত হয়। পণ্য যাতে ভোক্তার চাহিদা মেটাতে সমর্থ হয় তার ব্যবস্থা করা বিপণনের অন্যতম দায়িত্ব। বিপণন ক্রেতার চাহিদা গড়ে তোলে ও চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করে।

3. **মালিকানার পরিবর্তন** (Change of ownership) : উৎপাদকের কাছ থেকে ভোগকারীর কাছে পণ্যটিকে পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়া হল বিপণন। আর এই প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে পণ্যের মালিকানা ও অধিকারের পরিবর্তন ঘটে।

(খ) **তন্ত্রগত ধারণার** দিক থেকে এর বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

1. **গতিশীলতা** (Dynamism) : বিপণন হল একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। ব্যবহারকারীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিপণন সতত ক্রিয়াশীল। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের প্রয়োজন, আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা ও পছন্দেরও পরিবর্তন ঘটে। আর এই পরিবর্তনের সাথে তাল রেখে বিপণনেরও পরিবর্তন ঘটে। আর একারণেই গতিশীলতা বিপণনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

2. **অন্বেষণ** (Searching) : ক্রেতা ও তার চাহিদাকে আবিষ্কার করা হল বিপণনের আর এক বৈশিষ্ট্য। যেহেতু ক্রেতার চাহিদা বিপণনকে প্রভাবিত করে সেহেতু ক্রেতা ও তার চাহিদার সঠিক ধারণা পাওয়ার জন্য অন্বেষণের প্রয়োজন হয়। এজন্য বিপণনের ক্ষেত্রে বাজার গবেষণা, বাজার সমীক্ষা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

3. **সমন্বয়সাধন** (Co-ordinating) : বিপণন একটি সুসংহত ও সমবেত প্রক্রিয়া। ক্রেতার চাহিদার সাথে কারবারের সম্পদ ও পরিবেশের সীমাবদ্ধতার সমন্বয় সাধন করা বিপণনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

4. **বিপণন মিশ্রণ** (Marketing Mix) : পণ্য, দাম, প্রবর্তন ও বণ্টন এই চারটি হল বিপণন মিশ্রণের উপাদান। এই চারটি উপাদানকে এরূপভাবে মিশ্রিত করা হয় যাতে কারবারের দুটি মুখ্য উদ্দেশ্য—ক্রেতার তৃপ্তি ও মুনাফা অর্জন সম্ভব হয়।

পরিশেষে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে বলতে পারি যে, বিপণনের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—পণ্য বা সেবাকে ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেওয়া, ক্রেতার সন্তুষ্টি বিধান, পণ্য প্রবাহের বিভিন্ন স্তরে মালিকানার পরিবর্তন ও কারবারের উদ্দেশ্য সাধন।

১.৬ বিপণনের উদ্দেশ্য (Objectives of Marketing)

কারবার ও বিপণন পরস্পরের পরিপূরক। কারবার না থাকলে বিপণনের অস্তিত্বই থাকে না। আবার বিপণন না থাকলে কারবারের যে প্রধান উদ্দেশ্য লাভ অর্জন তা সম্ভব হয় না। কারণ বিপণন কারবারের পণ্য বা সোব বিক্রয়ের দায়িত্ব নেয়। আর বিক্রয়ের মাধ্যমেই কারবার আয় ও মুনাফা অর্জন করতে সমর্থ হয়। নীচে বিপণনের উদ্দেশ্যগুলি তুলে ধরা হল।

বিপণনের উদ্দেশ্য

- (i) কারবারের উদ্দেশ্যসাধন
- (ii) কারবারের উন্নয়ন
- (iii) স্বচ্ছ ভাবমূর্তি গড়ে তোলা
- (iv) ক্রেতা সন্তুষ্টি ও সমাজকল্যাণ
- (v) বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়সাধন
- (vi) কারবারের ঝুঁকি হ্রাস করা
- (vii) দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব

1. **কারবারের উদ্দেশ্যসাধন** (Accomplishment of business objective) : কারবার গড়ে ওঠে প্রধানত লাভের উদ্দেশ্যে। কারবারি কার্যকলাপ এমনভাবে পরিচালিত হয় যাতে কারবারি লেনদেনের ফলে মুনাফা অর্জন হয়। একটি কারবার বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপের সাথে জড়িত থাকে। কাঁচামাল, পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়, উৎপাদন, বিপণন, বণ্টন, আর্থিক, কর্মী সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যকলাপ কারবার গ্রহণ করে। এদের মধ্যে অধিকাংশ কার্যকলাপ ব্যয়-কেন্দ্রিক অর্থাৎ যাদের জন্য কারবারিকে অর্থ ব্যয় করতে হয়। একমাত্র ব্যতিক্রম হল বিপণন কার্যাবলি কারণ এটিই কেবলমাত্র আয় অর্জনে যুক্ত। কারবারের আয় থেকে ব্যয়গুলি বাদ দিলে, যা কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তাই হল লাভ বা মুনাফা। লাভ অর্জনের জন্যই কারবারে মূলধন বিনিয়োগ করা হয় ও বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপ গ্রহণ করা হয়। বিপণন কারবারের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ লাভ অর্জনকে সার্থক করে কারণ কারবারের পণ্য বা সেবার বিক্রয়ের দায়িত্ব নেয় বিপণন। তাই বিপণনের উদ্দেশ্য হল পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যাতে কারবার লাভ অর্জন করতে সক্ষম হয়। বিপণনের উদ্দেশ্য তাই কারবারের উদ্দেশ্যের চতুঃসীমার মধ্যে কাজ করে এবং কারবারি উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে কাজ করে। বিপণন কারবারের মুনাফাযোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেও কাজ করে।

2. **কারবারের উন্নয়ন** (Growth of business) : মুনাফা অর্জন কারবারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলেও এর অপর উদ্দেশ্য হল দীর্ঘকালীন স্থায়িত্ব। বিপণন হল কারবারের আয়ের উৎস এবং এর উপরেই কারবারের উন্নয়ন ও দীর্ঘকালীন স্থায়িত্ব নির্ভর করে। বিপণন বাজারে কারবারের পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। কারণ কারবারের ভাবমূর্তি ভালো হলে কারবারের প্রতি ক্রেতাদের আস্থা বৃদ্ধি পায়। ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করতে পারলে সহজেই বিপণনে সাফল্য পাওয়া যায় এবং কারবারের দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব ও উন্নয়ন ফলপ্রসূ হয়।

3. **কারবারের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি গড়ে তোলা** (Clear image of business) : বিপণনের অপর একটি উদ্দেশ্য হল বাজারে কারবারের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি গড়ে তোলা। কারণ কারবারের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি কারবারকে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা পেতে সাহায্য করে এবং প্রতিযোগীদের সাথে প্রতিযোগিতা মোকাবিলা করতে সাহায্য করে। এ কারণে বিপণন ক্রেতাদের সঠিক পণ্য, সঠিক ওজনে, সঠিক দামে, সঠিক সময়ে, সঠিক জায়গায় যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করে। এছাড়াও বিক্রয়-পরবর্তী পরিষেবা দেওয়ার মাধ্যমেও কারবারের ভাবমূর্তি উন্নত হয়। কাজেই বিপণনের উদ্দেশ্য হল কারবারের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি গড়ে তোলা যাতে ক্রেতাদের আস্থা ও আনুগত্য অর্জন করা যায়।

4. **ক্রেতা সন্তুষ্টি ও সমাজকল্যাণ** (Customer satisfaction and social welfare) : আধুনিক বিপণন হল ক্রেতা-কেন্দ্রিক ও সাথে সাথে সমাজকেন্দ্রিক। এর লক্ষ্য হল যাতে পণ্য বা সেবা তাদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয় ও যাতে ক্রেতারা তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হয়। তবে আধুনিক বিপণনের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ক্রেতা সন্তুষ্টিতেই শেষ হয়ে যায় না, সাথে সাথে সমাজকল্যাণের বিষয়টিও বিবেচনা করে।

5. **বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা** (Coordinating of departmental activities): বিপণন হল একটি সুসংহত কার্যকলাপ। বিপণনের সাফল্য কারবারের অন্যান্য বিভাগের কার্যকলাপের উপরও নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, ক্রয় বিভাগ সঠিক সময়ে সঠিক গুণমান সম্পন্ন কাঁচামাল ক্রয় না করলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। আর উৎপাদন ব্যাহত হলে তার প্রভাব বিপণনের উপরেও পড়ে। কাজেই কারবারের বিভিন্ন বিভাগের সাথে বিপণনকে সমন্বয় করতে হয়। অন্যথায় বিপণনে সাফল্য পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে ও বাজারে কারবারের সুনাম ব্যাহত হয়।

6. **কারবারের ঝুঁকি হ্রাস করা** (Reducing risk) : বিপণনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল কারবারের ঝুঁকি হ্রাস করা। কারবার হল ঝুঁকির ব্যাপার, কারণ অনিশ্চয়তার মধ্যে এর কাজকর্ম পরিচালিত হয়। আর মুনাফা হল ঝুঁকির পুরস্কার। কারবারে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকির

মোকাবিলা করতে হয়। তার মধ্যে অন্যতম হল পণ্য বা সেবার বিক্রয়। বর্তমানে কারবারের 'উদ্বৃত্ত' হল একটি সমস্যা এবং 'বিক্রয়' হল একটি সংকটপূর্ণ ক্ষেত্র। পণ্য নিজে থেকে বিক্রয় হয় না, বিক্রয় প্রসার বা সম্প্রসারণের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হয়। আর কারবারে পণ্য বিক্রয় না হলে কারবারের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। বিপণন পণ্য-বিক্রয়ের দায়িত্ব নেয় এবং বিভিন্ন বিক্রয় প্রসার কর্মসূচি ও কৌশল গ্রহণ করে পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। কাজেই পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত ঝুঁকি হ্রাস করে বিপণন কারবারকে স্থায়িত্ব দেয় ও গতিশীল রাখে।

7. **দীর্ঘকালীন স্থায়িত্ব** (Longer stability) : কারবার হল একটি কৃত্রিম ব্যক্তি যা আইন মোতাবেক গড়ে ওঠে। তাই কারবার চলমান প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধারাবাহিকভাবে কারবারি কাজকর্ম চালায়। কারবারের সাফল্যের উপরেই কারবারের দীর্ঘকালীন স্থায়িত্ব নির্ভর করে। অর্থাৎ কারবার যদি ধারাবাহিকভাবে মুনাফা অর্জন করতে পারে তাহলে কারবারের উন্নয়ন ঘটে ও কারবারি জগতে তার অস্তিত্ব মজবুত হয়। অন্যদিকে কারবার যদি ধারাবাহিকভাবে লোকসানে চলে তাহলে তার অস্তিত্ব সঙ্কটাপন্ন হয় এবং কালক্রমে বন্ধ হয়ে যায়। আর এই স্থায়িত্ব যেহেতু পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের মাধ্যমে আয় অর্জনের সাথে জড়িত তাই বিপণনের দায়িত্বও এর সাথে জড়িয়ে যায়। একারণেই বলা হয় যে বিপণনের উদ্দেশ্য হল কারবারের দীর্ঘকালীন স্থায়িত্ব বজায় রাখা ও কারবারকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়া।

8. **মধ্যবর্তী কারবারিদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা** (Creating good relationship with intermediaries) : পণ্য বিপণনের মাধ্যমে সময়গত, স্থানগত ও অধিকারগত বাধা দূর করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ বিপণনের উদ্দেশ্য হল এই বাধাগুলি দূর করে পণ্য বিক্রয়ের পথ প্রশস্ত করা। এছাড়াও পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মধ্যবর্তী কারবারির উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। কারণ পণ্য যেখানে উৎপাদন হয় এবং পণ্য যেখানে বিক্রয় হয় তাদের মধ্যে অনেক ব্যবধান থাকে। আর মধ্যবর্তী কারাবারিরা যেমন, একমাত্র বিক্রয় প্রতিনিধি, বণ্টনকারী, পাইকার, খুচরা কারবারি ইত্যাদির মাধ্যমে পণ্য চূড়ান্ত ভোগকারীর কাছে পৌঁছে এবং বিনিময়ের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় চূড়ান্ত রূপ পায়। কাজেই বিপণনের উদ্দেশ্য হল মধ্যবর্তী কারবারিদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা ও তা বজায় রাখা। কারণ এরা কেবলমাত্র পণ্য বিক্রয়েই সহায়তা করে না, সাথে সাথে বিপণনকারীকে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সরবরাহ করে যাতে বিপণন আরও কার্যকরী হতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে বিপণনের বহুমুখী উদ্দেশ্য রয়েছে এবং এদের সামগ্রিক ফল হল কারবারের উদ্দেশ্য সাধনের সাথে সাথে বাজারে কারবারের দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব বজায় রাখা, সুনাম গড়ে তোলা, প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জন, ক্রেতা সন্তুষ্টি ও সমাজকল্যাণ এবং বিভিন্ন পক্ষের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা ও বজায় রাখা।

১.৭ বিপণনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (Importance and necessity of marketing)

একটি প্রতিষ্ঠানের সাফল্য ও ব্যর্থতার পিছনে বিপণনের ভূমিকাই সর্বাধিক। এমনকি কোনো দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিও ওই দেশের বিপণন ব্যবস্থার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক বাজারে সাফল্য অর্জন করতে বিপণনই প্রধান ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও যেসব কারণে বিপণনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়, সেগুলি হল নিম্নরূপ—

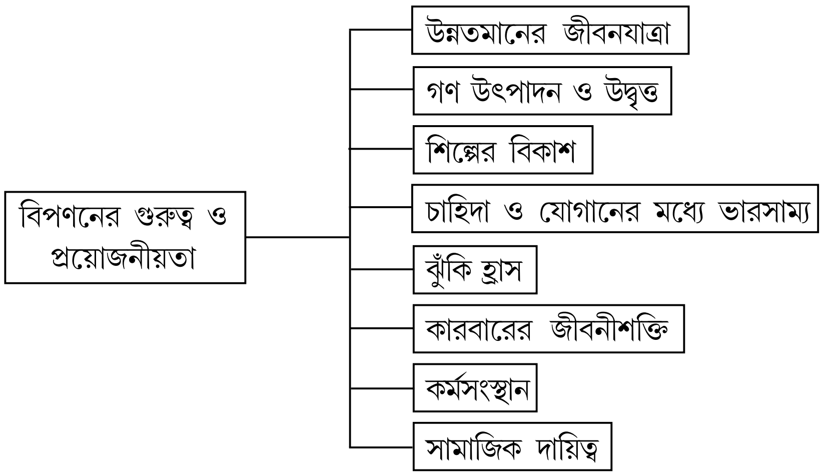

1. **উন্নতমানের জীবনযাত্রা** (High life style) : আক্রমণাত্মক বিপণনের ফলে মানুষ উন্নত জীবনযাত্রার স্বাদ পায়। বিপণন উন্নত জীবনযাত্রার জন্য মানুষের মনে আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করে এবং ব্যক্তির প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করে যা আবার উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। তাই অতীতের বিলাসদ্রব্য বর্তমানের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যে পরিণত হয়েছে। নতুন নতুন পণ্য ক্রয় করে মানুষ তার প্রয়োজন ও চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয় ও উন্নত জীবনযাত্রার স্বাদ পায়।
2. **গণ উৎপাদন ও উদ্বৃত্ত** (Mass production and surplus) : বর্তমান যুগ গণ-উৎপাদনের যুগ। গণ-উৎপাদনের ফলে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। কাঁচামালের সহজলভ্যতা ও গণ-উৎপাদন বিপণনের গুরুত্ব অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। অতীতে উৎপাদকদের মূল সমস্যা ছিল **'কাঁচামালের দুষ্প্রাপ্যতা'** (scarcity)। কিন্তু বর্তমানে এর সাথে আর একটি সমস্যা যুক্ত হয়েছে, যা হল **'উদ্বৃত্ত'** (surplus)। গণ-উৎপাদনের ফলে যে বিপুল পরিমাণ পণ্য উৎপাদন হয়, তা কীভাবে মানুষের ভোগে লাগবে তাই হল কারবারের বড় সমস্যা। বিপণন এই সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব নেয়। ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়া সচল থাকে।
3. **শিল্পের বিকাশ** (Industrial growth) : জনগণ শিল্পজাত দ্রব্য ভোগ করলে তবেই শিল্পের

বিকাশ ঘটে এবং সাথে সাথে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। অর্থাৎ শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার গড়ে না উঠলে শিল্পের বিকাশ সম্ভব নয়। বিপণন পণ্যের বাজার গড়ে তুলতে সাহায্য করে। বিপণন তাই পরোক্ষভাবে শিল্প প্রসারে সাহায্য করে এবং এভাবে সম্ভাব্য সম্পদকে প্রকৃত সম্পদে পরিণত করতে সাহায্য করে।

4. **চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য** (Equilibrium between demand and supply) : বিপণন একদিকে মানুষের চাহিদা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি না হলে উৎপাদনের কোনো প্রয়োজন হয় না। পণ্যের চাহিদা বাড়লে উৎপাদনও বাড়ে, যোগানও বাড়ে। এভাবেই গণ-উৎপাদন ও গণ সম্ভোগ যুগপৎ চলতে থাকে। বিপণন অগণিত মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যের যোগানের ব্যবস্থা করে ও সাথে সাথে মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে কারবারের উদ্দেশ্য সাধন করে।

5. **ঝুঁকি হ্রাস** (Risk reduction) : প্রত্যেক কারবারেই কিছু না কিছু ঝুঁকি থাকে। উৎপাদক পণ্য উৎপাদন করে এই আশায় যে তার পণ্য বিক্রয় হবে এবং বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন সম্ভব হবে। এই আশায় সে উৎপাদনের ঝুঁকি নেয়। বিপণন উৎপাদকের এই ইচ্ছাকে বিক্রয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করে। সুতরাং বলা যায় বিপণনই উৎপাদককে ঝুঁকি বহন করার ক্ষমতা দেয়।

6. **কারবারের জীবনীশক্তি** (Vitality in business) : বিপণন কারবারের মধ্যে জীবনীশক্তির সঞ্চার করে কারবারকে সজীব ও সচল রাখে। সেজন্য বিপণনকে মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে তুলনা করা হয়। বিপণন হল ক্রেতা ও বিক্রেতার মানসিক প্রস্তুতি। ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী বিক্রেতা পণ্যের যোগান দেয়। বিক্রেতা ক্রেতার চাহিদা জানার চেষ্টা করে আর ক্রেতা জানার চেষ্টা করে কোথায় তার প্রয়োজনীয় পণ্য পাওয়া যাবে। এই ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে কারবারে সজীবতা আসে ও ধারাবাহিকভাবে কারবার চলতে থাকে।

7. **কর্মসংস্থান** (Employment) : বিপণন একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন ধরনের মানুষ জড়িত। এসব মানুষ বিপণন সংক্রান্ত কাজকর্মের মাধ্যমেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। এভাবে বিপণন কর্মসংস্থানের পথ সুগম করে। এছাড়াও কারবারকে বাঁচিয়ে রাখতে ও কারবারের সম্প্রসারণ ঘটাতে বিপণন বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কারণ বিপণন ছাড়া কারবারের সাফল্য অসম্ভব। কারবার যেহেতু বহু মানুষের গ্রাসাচ্ছাদন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে সেহেতু বিপণন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু মানুষের কর্মসংস্থানের পথ সুগম করে।

8. **সামাজিক দায়িত্ব** (Social responsibility) : বিপণনের প্রধান লক্ষ্য হল পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে ক্রেতার সন্তুষ্টিবিধান। এজন্য বিপণন সঠিক মানের পণ্য, সঠিক দামে, সঠিক জায়গায়, সঠিক সময়ে সরবরাহের ব্যবস্থা করে। ভোক্তার সন্তুষ্টি বিধানে ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে

এভাবেই বিপণন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং বলা যায় বিপণন সামাজিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ক্রেতাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটায়।

এইসব গুরুত্বের জন্যই এই শতকের গোড়ায় বিপণন মানুষের কাছে আশীর্বাদ রূপে দেখা দিয়েছে। অবশ্য এর উল্টো দিকও আছে। অনেকে একে সমাজ দূষিতকরণের দানবীয় যন্ত্র বলেও মনে করেন। যাই হোক না কেন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে, কারবারের উদ্দেশ্য সাধনে, সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে ও ব্যক্তিবিশেষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিপণনের গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। দেশ, কাল, সমাজে কারবারের যদি গুরুত্ব থাকে তাহলে বিপণনের অবশ্যই গুরুত্ব আছে। কারণ বিপণন ছাড়া কারবারের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

১.৮ বিপণনের মৌলিক কার্যাবলি (Basic Marketing Functions)

সামগ্রিকভাবে বিপণনের যেসব কাজের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেগুলি সংক্ষেপে নীচে আলোচনা করা হল—

(ক) বিনিময় কার্যাবলি (Exchange Functions) : বিপণন কার্যকলাপের মূল ভিত্তি বিনিময়ের মধ্যেই রয়েছে, কারণ পণ্য বা সেবার প্রবাহ শেষ পর্যন্ত ক্রেতা বা ভোক্তার কাছেই পৌঁছায়। উৎপাদকের কাছ থেকে ভোক্তার কাছে পণ্য পৌঁছানোর প্রক্রিয়াকেই বিনিময় বলা হয়। বিনিময়ের দুটি প্রধান উপাদান হল ক্রয় ও বিক্রয়। বিনিময় কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হল—

1. **পণ্য পরিকল্পনা ও উন্নয়ন** (Product planning and Development) : বিনিময় প্রচেষ্টায় পণ্যই হল মূল উপাদান। পণ্যকে কেন্দ্র করেই বিনিময় সম্পন্ন হয়। পণ্যই ক্রেতার প্রয়োজন মেটায় ও সন্তুষ্টিদান করে। তাই বিপণনের প্রাথমিক কাজ হল পণ্য পরিকল্পনা, যাতে ক্রেতারা সহজেই সন্তুষ্ট হয়। কারণ ক্রেতারা সন্তুষ্ট হলেই পণ্যের বাজার প্রসারিত হয়। পণ্য পরিকল্পনার মধ্যে নতুন পণ্যের উদ্ভাবন, পণ্য মিশ্রণ, মূল্যায়ন, আকারগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

2. **মান নিরূপণ ও স্তর বিভাজন** (Standardising and Grading) : কারবারের উৎপাদিত সকল পণ্যের মান সমান হয় না। অবশ্য যেক্ষেত্রে পুরোপুরি যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পণ্য উৎপাদিত হয় সেক্ষেত্রে এই মান প্রায় সমান হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে পণ্যের গুণগতমান নিরূপণ করে তাদের বিভিন্ন শ্রেণিতে বা স্তরে বিভক্ত করা হয়। যেগুলি নিম্নমানের পণ্য সেগুলিকে বাতিল করা হয়। যেহেতু পণ্যের গুণমান ক্রেতার তৃপ্তিসাধনের সাথে সরাসরি যুক্ত সেহেতু বিপণনের একটি প্রধান কাজ হল পণ্যের মান নিরূপণ করা ও ওই মান অনুযায়ী তাদের বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা। এই স্তরভেদে পণ্যের দামেরও তারতম্য ঘটে। সেজন্য বাজারে একই পণ্যের বিভিন্ন মান, যেমন—1 নম্বর, 2 নম্বর, 3 নম্বর ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়।

3. **ক্রয় ও একত্রিকরণ** (Buying and Assembling) : ক্রয় ও একত্রিকরণ হল বিপণনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পণ্যের উৎপাদন বা পুনর্বিক্রয় করতে হলে পণ্যের কাঁচামাল বা পণ্য কিনতে হয়। এগুলি ঠিকমতো কিনতে না পারলে উৎপাদন ও বিপণন উভয়ই ব্যাহত হয়। আবার কাঁচামাল কেবল কিনলেই হবে না, সেগুলিকে একত্রিত করারও প্রয়োজন রয়েছে। কারণ একত্রিকরণের মাধ্যমেই কাঁচামাল পণ্যে পরিণত হয় এবং ক্রেতার প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ হয়। সেজন্য ক্রয় ও একত্রিকরণকে বিপণনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে চিহ্নিত করা হয়।

4. **বিক্রয়** (Selling) : বিপণনের অপর একটি কাজ হল বিক্রয়। অধিকাংশ কারবারের বিপণন কাজকর্ম এখনও বিক্রয়ের দিকে লক্ষ্য রেখেই পরিচালিত হয়। বিক্রয় বলতে এখানে কেবল পণ্যের মালিকানা হস্তান্তর (Transfer of ownership) বোঝায় না। বিক্রয় এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিপণনে বিক্রয় কাজের মধ্যে **মোড়াই, বিজ্ঞাপন, বিক্রয় সম্প্রসারণ, বিক্রয় পরবর্তী সেবা** প্রভৃতিও অন্তর্ভুক্ত থাকে। বিক্রয় বলতে ভবিষ্যৎ **ক্রেতা চিহ্নিতকরণ, তাদের চাহিদা সৃষ্টি** এবং **তাদের বিভিন্ন ধরনের তথ্য যোগান** দেওয়াও বোঝায়। বিক্রয়ের মধ্যে যেসব কাজকর্ম অন্তর্ভুক্ত সেগুলির যথাযথ সম্পাদনের উপরই কারবারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

(খ) সরবরাহ কার্য (Supply functions) : বিপণনের সরবরাহ কার্য বলতে বোঝায় যা পণ্যকে সঠিক সময়ে, সঠিক জায়গায়, সঠিক মূল্যে ও সঠিক পরিমাণে ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেয়। এই কাজ দু-ধরনের—

1. **মজুতকরণ** (Storing) : সম্ভাব্য চাহিদার উপর ভিত্তি করে পণ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হয়। পণ্যের যোগান অব্যাহত রাখতে ও সুষম বণ্টনের স্বার্থে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের আগে গুদামে মজুত করার প্রয়োজন হয়। একেই মজুতকরণ বা গুদামজাতকরণ বলে। কারবার যে তিনটি কারণে পণ্য গুদামজাত করে সেগুলি হল—উৎপাদন বা বিক্রয়ের **ঋতুকালীন বৈষম্য** (Seasonal variation) দূর করার জন্য, কিছু কিছু কারবারি কার্যকলাপ থেকে **অর্থনৈতিক সুবিধা** পাওয়ার জন্য ও পণ্যের **মান** ও **মূল্য** বৃদ্ধির জন্য। প্রকৃতপক্ষে মজুতকরণের মূল লক্ষ্য হল কারবারি জগতে **স্থান** ও **কালের বাধাকে** অতিক্রম করা।

2. **পরিবহন** (Transportation) : বিপণনের কাজ হল পণ্যকে ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেওয়া। যেহেতু উৎপাদক ও ভোক্তা একই স্থানে অবস্থান করে না সেহেতু পরিবহন ছাড়া বিপণন অসম্ভব। পরিবহন হল বিপণনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম যা পণ্যকে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেয়। এই নির্দিষ্ট জায়গাটি হল পণ্যের বাজার। যেহেতু বাজারগুলি ভৌগোলিক দিক থেকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন সেহেতু বিপণনে পরিবহন অপরিহার্য। পরিবহন মূলত তিন প্রকারের—জল, স্থল ও আকাশ পরিবহন। বিপণনের ক্ষেত্রে সেই পরিবহন মাধ্যমই নির্বাচন করা হয় যার

মধ্যে দ্রুতি (speed) বর্তমান ও ব্যয়বহুল নয় (economy)। উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা বিপণনের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

(গ) সহায়ক কার্যাবলি (Supporting functions) : যদিও সহায়ক কাজগুলি পণ্য বিক্রয়ে তথা মালিকানা হস্তান্তরের সাথে সরাসরি যুক্ত নয়, তবুও বিপণন কার্যকলাপের ক্ষেত্রে এ্যদের যথেষ্ট ভূমিকা থাকে। সহায়ক কাজের অন্তর্ভুক্ত হল—

1. **বিপণনের অর্থসংস্থান** (Marketing financing) : বিপণন হল একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে যেসব কাজ করতে হয় তার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। বিপণনের কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য অর্থসংস্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিপণনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন, পণ্যের মজুতকরণ, পরিবহন, ক্রয় পরবর্তী সেবা প্রভৃতি কাজে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। সেজন্য বিপণের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল বিপণনের জন্য অর্থ সংস্থান।

2. **ঝুঁকি গ্রহণ** (Risk taking) : কারবারি কার্যকলাপ সরল নয়। সুতরাং বিপণনের কাজকর্ম সরল হবে এরূপ আশা করা অর্থহীন। প্রচলিত প্রবাদ হল—'ঝুঁকি যেখানে লাভ সেখানে।' অর্থাৎ লাভ করতে হলে অল্পবিস্তর ঝুঁকি অবশ্যই নিতে হবে।

   বিপণনে ঝুঁকি সাধারণত সৃষ্টি হয় **চাহিদা-যোগানের পরিবর্তন** (changes in demand-supply) ও **বাজার সংক্রান্ত** বিভিন্ন কারণে। পণ্য উৎপাদন হল ঝুঁকির ব্যাপার। কারণ ধরে নেওয়া হয় যে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় হবে। বিপণন এই ঝুঁকি বহন করে কারণ পণ্য বিক্রয়ের দায়িত্ব বিপণন গ্রহণ করে। অন্যান্য ক্ষতির থেকে পণ্যকে রক্ষা করার জন্য বীমা (insurance) করাও এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এছাড়াও বিক্রয়জনিত ঝুঁকি এড়াবার জন্য বিজ্ঞাপন, জনসংযোগ ও বিক্রয় প্রসারের অন্যান্য কলা-কৌশলও বিপণনের কাজের অন্তর্ভুক্ত।

3. **গবেষণা, তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণ** (Research, Collection and Analysis of marketing information) : বিপণন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বাজার গবেষণা, বাজার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও তাদের বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। অন্যথায় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। বিপণনের সাফল্য যেসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেগুলি হল—**বাজারের আয়তন, অবস্থান ও চরিত্র, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ক্রেতাদের প্রয়োজন, ক্রয় অভ্যাস, পছন্দ, প্রতিযোগীদের কৌশল, দুর্বলতা, শক্তি ও কার্যকলাপ** এবং সর্বোপরি **চাহিদা ও যোগানের গতি-প্রকৃতি**। বাজার গবেষণার মাধ্যমে এসব তথ্য সংগ্রহ করা এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বিপণনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সহায়ক কাজ হিসাবে বিপণনের এসমস্ত কাজ অন্যান্য সকল কাজকে নিয়ন্ত্রিত করে।

অতএব আমরা বলতে পারি যে বিপণনের মৌলিক কাজগুলিকে যেভাবেই বিন্যস্ত করা হোক না কেন, শ্রেণিবিন্যাস গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হল বিপণনের কাজগুলি। তাই পরিশেষে বলা যায়—

"Marketing is a dynamic process—a total, integrated—rather than fragmented assortment of institutions and functions. Marketing is not only one activity, nor is it the sum of several; rather it is the result of interaction of many activities."—(Philip Kotler)।

১.৯ বিপণন মিশ্রণ (Marketing Mix)

'বাজার' ও 'বিপণন' সম্পর্কে আলোচনাকালে দেখা গেছে যে বাজার হল '**বাস্তব**' আর বিপণন হল '**ভবিষ্যৎ**'। বস্তুত বিপণন ব্যবস্থাপনা হল এই 'বাস্তব' ও 'ভবিষ্যতের' সংমিশ্রণ, আর বিপণন কৌশল হল এই সংমিশ্রণের উপায়, এক সংযোগকারী সূত্র। একটি প্রতিষ্ঠানকে ধারাবাহিকভাবে টিকে থাকতে হলে তার অতীত ও বর্তমানকে ভবিষ্যতের সাথে সংযোগ ঘটাতে হয়। এই সংযোগ ঘটানোর কাজই হল বিপণন ব্যবস্থাপনার প্রধান কাজ। আর এই কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিপণন মিশ্রণ একটি কৌশল হিসাবে কাজ করে।

Philips Kotler ও **Gary Armstrong** তাঁদের Principles of Management গ্রন্থে বলেছেন: কোম্পানি তার প্রতিযোগিতামূলক বিপণন কৌশল একবার ঠিক করে ফেললে তার পরবর্তী কাজ হল বিপণন মিশ্রণের প্রতিটি অংশের পরিকল্পনা রচনা করা। তাঁদের অভিমত হল বিপণন মিশ্রণ আধুনিক বিপণনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। বিপণন মিশ্রণ হল একগুচ্ছ নিয়ন্ত্রণযোগ্য কুশলী বিপণন হাতিয়ারের মিশ্রণ যা নির্দিষ্ট কোনো বাজারে আশানুরূপ সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়। একটি সংস্থা বাজারে তার পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করার জন্য যা কিছু করতে পারে, সবই বিপণন মিশ্রণের অন্তর্ভুক্ত।

'**বিপণন মিশ্রণ**'-এর ভাবনা প্রথম তুলে ধরেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক **নীল বোর্ডেন** (Neil H. Borden)। তাঁর কথায় বিপণন মিশ্রণ হল কোনো এক সময়ে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিপণনের উপাদানগুলি ও বিপণন প্রচেষ্টার মধ্যে সংহতি সাধনের সর্বোত্তম উপায়। প্রতিষ্ঠান তার বিপণন মিশ্রণ স্থির করার পূর্বে যেসব বিষয়গুলি বিবেচনা করে সেগুলি হল—

(1) বাজারে উদ্ভূত যেসব শক্তি প্রতিষ্ঠানের বিপণন কার্যাবলিকে প্রভাবিত করে যেমন—চাহিদা, দাম, পণ্য স্বীকৃতি ও (2) একটি কার্যকরী ও দক্ষ বিপণন কার্যসূচির নিয়ম ও নীতি সমূহ যেমন—বণ্টন নীতি, বিক্রয় প্রসার নীতি ইত্যাদি। বস্তুত বিপণন মিশ্রণ বলতে বোঝায় বিভিন্ন উপাদানের সংযুক্তি যা সামগ্রিকভাবে একটি প্রতিষ্ঠানের 'বিপণন পদ্ধতি' গড়ে তোলে। এই উপাদানগুলি **'4-Ps'** নামেই সমধিক পরিচিত। এই চারটি 'P' হল যথাক্রমে **পণ্য** (Product), **দাম** (Price), **বণ্টন** (Placement) ও **বিক্রয় প্রসার** বা **প্রবর্তন** (Promotion)। চিত্রাকারে প্রকাশ করলে বিপণন মিশ্রণের যে কাঠামোটি পাওয়া যায় সেটি হল নিম্নরূপ—

১.১০ সারাংশ

বিপণন হল সেই সমস্ত ব্যবসায়িক কার্যকলাপ, যা পণ্য বা সেবাকে উৎপাদকের কাছ থেকে ভোক্তার কাছে নিয়ে যায়। এটি হল সামাজিক ও ব্যবস্থাপনামূলক প্রক্রিয়া যারা দ্বারা পণ্য বা উপযোগের সৃষ্টি হয় এবং পণ্য ও মূল্যের বিনিময়ে ব্যক্তিবিশেষ ও গোষ্ঠী তাদের প্রয়োজন ও চাহিদা মেটায়। বিপণন সম্পর্কে ধারণার বিষয় আলোচনা করার সময় যেসব বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল বিপণনের উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব, কার্যাবলি ইত্যাদি। এই সব বিষয় আলোচনার সময় যা প্রাসঙ্গিকভাবে এসে পড়েছে সেগুলি হল—বিপণনের অর্থনৈতিক দিক ও সামাজিক দিক। বিপণনের মাধ্যমে কারবার মুনাফা অর্জন করে ঠিকই, কিন্তু বর্তমানে যে বিষয়গুলি বেশি প্রাধান্য পায় সেগুলি হল বিপণনের মাধ্যমে কারবারের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি গড়ে তোলা, ক্রেতা সন্তুষ্টি ও সমাজকল্যাণ। শুধু তাই নয়, আলোচনার মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে বিপণনের প্রধান কার্যাবলি যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পণ্য পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, মান নিরূপণ ও স্তর বিভাজন, ঝুঁকি গ্রহণ ইত্যাদি। বিপণনের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বিপণন মিশ্রণ যাকে প্রচলিত অর্থে '4-Ps' বলে। এগুলির মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোনো বাজারে প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্য বা সেবার আশানুরূপ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। সুতরাং এই একক পাঠ করার মাধ্যমে বিপণন সম্পর্কে প্রাথমিক অথচ স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে।

১.১১ অনুশীলনী

ক) বহুপছন্দ ভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। ব্যবস্থাপনাগতভাবে বিপণন হল—

ক) পণ্য বিক্রয়ের কলা
খ) ক্রেতার চাহিদাপূরণ
গ) বিক্রয় করা
ঘ) গণবাজার

২। বিপণন মিশ্রণের ধারণাটি জনপ্রিয় কে করেছিলেন?

ক) নীল বোর্ডেন খ) ম্যাকার্থী

গ) পিটার ড্রাকার ঘ) লটারবর্ন

৩। বিপণন মিশ্রণের দুটি মুখ্য উদ্দেশ্য হল—

ক) বিক্রয় ও মুনাফা অর্জন খ) চাহিদাপূরণ ও লেনদেন

গ) ক্রেতা সন্তুষ্টি ও মুনাফা অর্জন ঘ) চাহিদা সৃষ্টি ও বিক্রয় বৃদ্ধি

৪। বিপণনের গুরুত্ব হিসাবে নীচের কোনটি গণ্য হয় না?

ক) গণ উৎপাদন ও উদ্বৃত্তজনিত সমস্যার সমাধান

খ) পণ্য পরিকল্পনা

গ) কর্মসংস্থান

ঘ) সামাজিক দায়িত্বপালন

৫। বিপণন মিশ্রণের উপাদানগুলি নামে পরিচিত। নীচের কোনটি এর অন্তর্ভুক্ত নয়?

ক) পণ্য বা সেবা খ) দাম

গ) মোড়কবন্ধন ঘ) ভৌত বণ্টন

খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

1. বিপণন কী? (What is marketing?)
2. বিপণনের সংজ্ঞা দিন। (Give the definition of marketing.)
3. বিপণনের চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন। (State four features of marketing.)
4. বিপণনের কয়েকটি উদ্দেশ্য ব্যক্ত করুন। (State four objectives of marketing.)
5. বিপণনের চারটি গুরুত্ব উল্লেখ করুন। (State four importances of marketing.)

গ) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

1. বিপণনের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।
2. বিপণনের উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা করুন।
3. বিপণনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাগুলি কী কী?
4. বিপণনের মৌলিক কার্যাবলি আলোচনা করুন।
5. বিপণন মিশ্রণের উপাদানসমূহ আলোচনা করুন।

একক ২ ❑ বাজার বিভাজন (Market Segmentation)

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ প্রস্তাবনা

২.৩ বাজার বিভাজন—ধারণা

২.৪ উদ্দিষ্ট বা লক্ষ্য বাজার

২.৫ বাজার বিভাজনের গুরুত্ব

২.৬ বাজার বিভাজনের ভিত্তিসমূহ

২.৭ বাজার বিভাজনের ভিত্তি নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

২.৮ পণ্য পৃথকীকরণ

২.৯ বাজার বিভক্তিকরণ ও পণ্য পৃথকীকরণের মধ্যে পার্থক্য

২.১০ সারাংশ

২.১১ অনুশীলনী

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি থেকে আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অবহিত হবেন—

- বাজার বিভাজন সম্পর্কে ধারণা
- বাজার বিভাজনের গুরুত্ব
- উদ্দিষ্ট বা লক্ষ্য বাজার কী
- বাজার বিভাজনের গুরুত্ব ও ভিত্তিসমূহ
- বাজার বিভাজনের ভিত্তি নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ
- পণ্য পৃথকীকরণ

২.২ প্রস্তাবনা

বাজার বিভাজন বা বিভক্তিকরণ হল পণ্য বা সেবার বাজার ছোট ক্রেতাগোষ্ঠীর মধ্যে বিভক্ত করা যাদের নির্দিষ্ট প্রয়োজন, চরিত্র ও চাহিদা আছে এবং তাদের প্রত্যেককে সন্তুষ্ট করার জন্য বাজার

বিভাজনের উদ্দেশ্য হল ক্রেতাদের চাহিদা উপযোগী পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা। এই বাজার বিভাজনের ভিত্তি হল ভোক্তার বাজার ও ব্যবসায়িক বাজার। ভোক্তার বাজার সাধারণভাবে ভৌগোলিক, জনসংখ্যা ও তার বয়স, লিঙ্গ, আয় ইত্যাদির উপর যেমন নির্ভর করে, তেমনি তাদের মনস্তত্ত্ব ও আচরণের উপরও নির্ভর করে। বাজার বিভাজন যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভরশীল তাদের মধ্যে প্রধান হল পণ্য বা সেবার সহজগম্যতা, বিপণনকারীর কর্মসম্পাদন যোগ্যতা ইত্যাদি। এই একক থেকে বাজার বিভাজন ছাড়াও আরও যে সকল বিষয় সম্পর্কে জানা যাবে তার মধ্যে অন্যতম হল পণ্য পৃথকীকরণ। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যা অন্য কোনো পণ্যের থেকে কোনো একটি পণ্যকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব। এবং কোনো পণ্যের বিপণনের USP সাধারণত তার পণ্য পৃথকীকরণের প্রধান ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত হয়। সুতরাং বাজার বিভাজন ও পণ্য পৃথকীকরণ সম্পর্কে এই একক থেকে প্রয়োজনীয় ধারণা পাওয়া যাবে।

২.৩ বাজার বিভাজন—ধারণা (Market Segmentation—Concept)

কোনো পণ্য বা সেবার বাজার গড়ে ওঠে বিভিন্ন ক্রয়ক্ষমতা সম্পন্ন ক্রেতাদের নিয়ে। কারণ সকল ক্রেতার পছন্দ ও চাহিদা যেমন এক নয়, তেমনি তাদের ক্রয়ক্ষমতাও এক নয়। সুতরাং পণ্যের বৃহত্তর বাজারের মধ্যে বিভিন্ন ক্রয়ক্ষমতা সম্পন্ন ক্রেতাদের নিয়ে ওই পণ্য বা সেবার কতকগুলি উপবাজার গড়ে উঠে। বাজার বিভাজন হল এই উপবাজারগুলির সনাক্তকরণ। এই উপবাজারের ক্রেতাদের চরিত্র ও ক্রয়ক্ষমতা প্রায় একই ধরনের। এই উপবাজারগুলি মিলিতভাবে পণ্যের বাজার গড়ে তোলে। অন্যভাবে বলা যায় যে বাজার বিভাজন বা বিভক্তকরণ হল সদৃশ বা সমজাতীয় ক্রেতাদের চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া যাদের দিকে লক্ষ্য রেখে বিপণনকারী তার বিপণন মিশ্রণ তৈরি করে। বস্তুত পণ্য বা সেবার বৃহত্তর বাজার যেসব ক্রেতাদের নিয়ে গড়ে ওঠে তারা প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন চরিত্রের। আবার এই ক্রেতাদের মধ্যে কিছু ক্রেতা থাকে যারা অভিন্ন চরিত্রের। এরা মিলিতভাবে বৃহত্তর বাজারের মধ্যে যে ছোটো ছোটো বাজার গড়ে তোলে সেগুলিই হল উপবাজার। এই উপবাজারগুলি চিহ্নিত করা ও ক্রেতাদের প্রয়োজন ও চাহিদা মেটানোর উপযোগী পণ্য ও সেবা সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে বাজার বিভাজন বা বাজার বিভক্তকরণ করা হয়। অর্থাৎ একই ব্র্যান্ডের পণ্য বা সেবা দিয়ে বৃহত্তর বাজারের সমস্ত ক্রেতাদের সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়। প্রতিটি উপবাজারের ক্রেতাদের সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে পৃথক ব্র্যান্ডের উপযোগী পণ্য বা সেবা সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়।

কোট্‌লার বলেছেন বাজার বিভাজন বা বিভক্তকরণ হল পণ্য বা সেবার বাজার ছোটো ক্রেতাগোষ্ঠীর মধ্যে বিভক্ত করা যাদের নির্দিষ্ট প্রয়োজন, চরিত্র ও চাহিদা রয়েছে এবং তাদের প্রত্যেককে সন্তুষ্ট করার জন্য বাজার বিভাজনের উদ্দেশ্য হল ক্রেতাদের চাহিদা-উপযোগী পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

২.৪ উদ্দিষ্ট বা লক্ষ্য বাজার (Target market)

বাজার বিভাজন বিপণনকারীর কাছে পণ্য বিপণনের সুযোগ তুলে ধরে। বাজার বিভাজনের মাধ্যমে যে ছোটো ছোটো বাজারের সৃষ্টি হয় বিপণনকারীকে তাদের মূল্যায়ন করতে হয় এবং স্থির করতে হয় যে তার পক্ষে কোন্ বাজারের ক্রেতাদের সবচেয়ে ভালোভাবে সেবা দেওয়া সম্ভব। যদি একাধিক বাজারকে ভালোভাবে সেবা দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে সেগুলি চিহ্নিত করতে হয়। **উদ্দিষ্ট** বা **লক্ষ্য** বাজার (target market) যেসব ক্রেতাদের নিয়ে গড়ে ওঠে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, প্রয়োজন, আকাঙ্ক্ষা, ক্রয়ক্ষমতা, ক্রয়ের ধরন ইত্যাদি সমরূপ হয়। এই বাজারে বিপণনকারী ক্রেতাদের সর্বোত্তম সেবা দিতে পারবে বলে মনে করে। তাই বিপণন কৌশলও এই বাজারের দিকে লক্ষ্য রেখেই চূড়ান্ত করা হয়। যেক্ষেত্রে বিপণনকারী একাধিক বাজারকে লক্ষ্য-বাজার হিসাবে নির্বাচন করে সেক্ষেত্রে প্রত্যেক বাজারের জন্য পৃথক বিপণন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। একারণেই দেখা যায় যে **হিন্দুস্থান ইউনিলিভার** আট ধরনের 'টয়লেট সাবান' উৎপাদন ও বিপণন করে, **মারুতি** সাত-আট ধরনের ছোটো মোটর গাড়ি উৎপাদন ও বিপণন করে, **প্রকটার অ্যান্ড গ্যাম্বল** ছয় ধরনের গুঁড়ো সাবান উৎপাদন ও বিপণন করে যাতে বৃহত্তর বাজারের অন্তর্গত সমস্ত উপবাজারের ক্রেতাদের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হয়।

উদ্দিষ্ট বা লক্ষ্য-বাজার স্থির করার পিছনে বিপণনকারীর পরিকল্পনা হল যাতে ক্রেতার পছন্দ অনুযায়ী পণ্য ও সেবা সরবরাহ করা সম্ভব হয় এবং যাতে প্রতিটি বাজারে তার অবস্থান মজবুত হয়। একাধিক লক্ষ্য-বাজারে বিপণনকারী তার অবস্থান মজবুত করতে সমর্থ হলে মোট বিক্রয় বেশি হয় যা বৃহত্তর বাজারে গণবিপণনের মাধ্যমে সম্ভব হয় না। এধরনের বিপণন কৌশলে মোট বিক্রয় যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি মোট বিপণন ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। কারণ প্রতিটি উপবাজারের জন্য আলাদা পণ্য উৎপাদন করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, 10টি উপবাজারের প্রতিটির জন্য যদি 10 ইউনিট পণ্য উৎপাদন করতে হয়, তবে তার ব্যয় সমগ্র বাজারের জন্য যদি 100 ইউনিট পণ্য উৎপাদন করা হয় তার ব্যয়ের থেকে বেশি হয়। এছাড়াও প্রতিটি অংশ-বাজারের জন্য পৃথক বিপণন পরিকল্পনা, পৃথক বিপণন প্রসার কর্মসূচি, বণ্টন ব্যবস্থা, বিজ্ঞাপন অভিযান করতে হয় যার ফলে ব্যয়বৃদ্ধি ঘটে। সুতরাং বিপণনকারীকে দেখতে হবে যে বিক্রয়বৃদ্ধির সাথে সাথে যাতে ব্যয়ের সামঞ্জস্য থাকে। অন্যথায় পণ্য বিপণন লাভজনক হয় না।

লক্ষ্য বা উদ্দিষ্ট বাজারে বিপণন তিন ধরনের কার্যকলাপ নিয়ে গড়ে ওঠে। এগুলি হল—(i) **বাজার বিভাজন** বা **বিভক্তকরণ** (segmentation), (ii) **অভীষ্ট বা লক্ষ্য-বাজার স্থির করা** (market targeting) ও (iii) **বাজারে অবস্থান প্রতিষ্ঠিত করা** (market positioning)। আবার অভীষ্ট বাজার চারটি স্তরে স্থির করা হয়। এগুলি হল—(i) বাজার বিভাজন (segmentation), (ii) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্বতন্ত্র গোষ্ঠী নির্বাচন (Niches), (iii) স্থানীয় বাজার (local market) এবং একক ব্যক্তি (individual)।

২.৫ বাজার বিভাজনের গুরুত্ব (Importance of Market Segmentation)

গণ-বিপণনে (mass marketing) সমগ্র বাজারে বিপণন কার্যকলাপ চালানো হয়। অর্থাৎ বাজারের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ধরনের ক্রেতার জন্য একটি মাত্র পণ্যই সরবরাহ করা হয়। ফলে প্রতিটি ক্রেতাকে সর্বোত্তম তৃপ্তি ও সন্তুষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় না। তাছাড়াও গণ-বিপণনে প্রয়োজন হয় গণ-উৎপাদন, গণবণ্টন ও অনেক বেশি মূলধন। কিন্তু বৃহত্তর বাজারকে যদি ছোটো ছোটো অংশে বিভক্ত করা হয় এবং এই অংশ-বাজারকে লক্ষ্য রেখে পণ্য বিপণনের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে সবদিক থেকেই সুবিধা হয়। অর্থাৎ গণ-উৎপাদন ও গণবণ্টনের যেমন প্রয়োজন হয় না, তেমনি প্রচুর মূলধনেরও প্রয়োজন হয় না। অথচ বিপণনে সাফল্য পাওয়াও সহজ হয়। যেসব কারণে বাজার বিভাজনের গুরুত্ব বোঝা যায় সেগুলি হল নিম্নরূপ :

(i) **বিপণনকারীর সুবিধা** (Benefit of marketer) : পণ্য বা সেবার বিপণন একটি সংকটপূর্ণ ক্ষেত্র। সঠিক বিপণনের উপরই পণ্যের বিক্রয় নির্ভর করে। আবার পণ্য বিক্রয় না হলে কারবার চলতে পারে না। তাই কারবারে বিপণনকারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাজার বিভাজন বিপণনকারীর কাজকে অনেক সহজ করে দেয়। বিপণন পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার সময়ই সে জানে যে কোন্ বাজার-অংশে পণ্য বিক্রয় করা হবে ও তাদের সন্তুষ্টি-মাত্রা কীরূপ। এসব বিষয় জানা থাকার ফলে তার পক্ষে বিপণন কার্যাবলি পরিচালনা করা ও পণ্য বিক্রয় করা অনেক সহজ হয়।

(ii) **ক্রেতা-সন্তুষ্টি** (Customer Satisfaction) : আধুনিক বিপণন ক্রেতা-কেন্দ্রিক। তাই বর্তমানে ক্রেতা-সন্তুষ্টি বিপণনের লক্ষ্য, পণ্য বিক্রয় করাই যথেষ্ট নয়। পণ্য ক্রয় করে ক্রেতা যাতে সর্বাধিক সন্তুষ্টি পায় এবং বারে বারে পণ্য ক্রয় করে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বিপণন পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়।

(iii) **ব্যয় সংকোচ** (Cost-effective) : সমগ্র বাজারে বিপণন কার্যকলাপ চালাতে হলে গণ-উৎপাদন, গণ-বণ্টন, গণ-বিপণনের প্রয়োজন হয়। এজন্য প্রচুর পরিমাণে মূলধনের প্রয়োজন হয় যা ছোটো ও মাঝারি কারবারের পক্ষে যোগান দেওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু সমগ্র বাজারের পরিবর্তে যখন কোনো বাজার-অংশের ক্রেতাদের দিকে লক্ষ্য রেখে বিপণন কার্যকলাপ চালানো হয় তখন কম মূলধনের প্রয়োজন হয়। কারণ সবকিছুই স্বল্প পরিসরে সম্পন্ন করা হয়।

(iv) **উন্নত পরিষেবা** (Better Service) : বৃহত্তর বাজারকে যখন ছোটো ছোটো বাজার-অংশে বিভক্ত করা হয় তখন বিপণন একমুখী, সরল ও উদ্দেশ্যমূলক হয়। যেহেতু বাজার-অংশের ক্রেতাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিপণনকারী ওয়াকিবহাল থাকে তাই ক্রেতাদের সর্বাধিক পছন্দের

পণ্য ও সেবা সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে বিপণনকারী যেসব বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয় সেগুলি হল—সময়গত বাধা, দূরত্বগত বাধা, সাংস্কৃতিক বাধা ইত্যাদি দূর করা। এছাড়াও ক্রেতাদের পণ্য সম্পর্কে অভিযোগ থাকলে তা শোনা ও তার সমাধানের মাধ্যমে ক্রেতা সন্তুষ্ট করাও বিপণনকারীর পক্ষে সহজ হয়। আর এসবের নিটফল হল ক্রেতাদের উন্নত পরিষেবা প্রদান।

(v) **নিবিড় ক্রেতা সম্পর্ক** (Firm customer relation) : ক্রেতা-সম্পর্কই হল বিপণন সাফল্যের চাবিকাঠি। ক্রেতাদের সাথে সম্পর্ক যত ভালো হবে বিপণনে সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনাও তত বেশি থাকে। তাই বর্তমানে বিপণন সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল—'সম্পর্ক গড়ে তোলো, বিক্রয় তাকে অনুসরণ করবে' ('Build relationship, sell will follow')। বাজার অংশে যখন বিপণন কার্যকলাপ চালানো হয় তখন আনুপাতিকভাবে কম পরিসরে কম সংখ্যক ক্রেতাদের মধ্যে কাজ করা হয়। ফলে তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা সহজ হয়।

(vi) **প্রতিযোগিতার মোকাবিলা** (To face the competition) : বাজার বিভাজন বিপণনকারীকে প্রতিযোগিতা মোকাবিলা করতে সাহায্য করে। বিপণনকারী প্রতিযোগীদের কৌশলকে প্রতিহত করার জন্য আরও বিভিন্ন অংশ-বাজারে কার্যকরী বিপণন কৌশল গ্রহণ করতে পারে। এর ফলে বাজারের প্রতিযোগিতা মোকাবিলা করা অনেক সহজ হয়।

(vii) **উপযোগী বিপণন কর্মসূচি** (Suitable marketing programme) : যেহেতু বাজার বিভাজনের ফলে একাধিক ছোটো ছোটো স্বতন্ত্র বাজার গড়ে ওঠে তাই প্রতিটি বাজারের জন্য পৃথক বিপণন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এর ফলে ক্রেতাদের কম দামে আরও ভালো পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয় এবং বিপণনে সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়।

(viii) **প্রতিষ্ঠানের সম্পদের লাভজনক ব্যবহার** (Profitable use of resources) : বাজার বিভাজনের ফলে বিভাজিত বাজারগুলি সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া যায় যা সাধারণভাবে বিপণনকারীর গোচরে থাকে না। এই তথ্যগুলি পরবর্তীকালে পণ্য বা সেবার উন্নয়নে ও বিপণন গবেষণায় ব্যবহৃত হয়। সুতরাং বাজার বিভাজন উৎপাদক সংস্থাকে তার সম্পদের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

২.৬ বাজার বিভাজনের ভিত্তিসমূহ (Bases of Market Segmentation)

সাধারণভাবে বাজার বিভাজন কতকগুলি চলকের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে এবং এগুলিকেই এককথায় বাজার বিভাজনের ভিত্তি বলা হয়। বাজার মূলত দু-ধরনের—(A) **ভোক্তার বাজার** (Consumer market) ও (B) **ব্যবসায়িক বাজার** (Business market)। যেহেতু এই দুই বাজারের

প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে তাই তাদের বিভাজনের ভিত্তিগুলিও এক নয়, আলাদা। সেকারণেই আমাদের আলোচনাও এই দু-ধরনের বাজারকে কেন্দ্র করেই করা হয়েছে।

A ভোক্তার বাজার বিভাজনের ভিত্তিসমূহ (Bases of Market Segmentation)

ভোক্তার বাজার বিভাজনের ক্ষেত্রে দু-ধরনের চলকের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। অনেকেই ভোক্তা বা ক্রেতাদের **বৈশিষ্ট্যের** উপর ভিত্তি করে বাজার বিভাজন করে থাকেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল— **ভৌগোলিক** (geographical), **জনসংখ্যামূলক** (demographic) ও **মানসিক গঠন** (psychography)। অন্যদিকে কেউ কেউ ক্রেতাদের **'আচরণমূলক'** (behavioural) বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বাজার বিভাজন করে থাকেন। নীচে তালিকার মাধ্যমে বাজার বিভাজনের চলকগুলি ও তাদের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি তুলে ধরা হল।

(a) ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক ভিত্তি—পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, মধ্য ইত্যাদি অঞ্চল।

(b) জনসংখ্যা বিষয়ক ভিত্তি—বয়স, লিঙ্গ, আয়, শিক্ষা, জীবিকা ইত্যাদি।

(c) সামাজিক ভিত্তি—সামাজিক মর্যাদা ও শ্রেণি।

(d) মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি—দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, ক্রয়-অভ্যাস।

(e) আয়তন ভিত্তিক—ক্রয়ের পরিমাণ।

(f) গুণমান ভিত্তিক—গুণমান সংক্রান্ত সচেতনতা।

(g) ব্যবহার ভিত্তিক—একই পণ্যের একাধিক ব্যবহার।

নীচে প্রতিটি বিষয় সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া হল।

1. **ভৌগোলিক বিভাজন** (Geographic Segmentation) : ভৌগোলিক সীমানার উপর ভিত্তি করে যখন বাজারের বিভাজন করা হয় তখন তাকে ভৌগোলিক বিভাজন বলে। এরূপ বিভাজনের উদাহরণ হল—রাজ্য, জেলা, শহর, গ্রামীণ এলাকা, শহরতলি ইত্যাদি। বিপণনকারী এক বা একাধিক ভৌগোলিক অঞ্চলে তার পণ্য বিপণন করতে পারে। কিন্তু তাকে অবশ্যই অঞ্চলভিত্তিক প্রয়োজন ও চাহিদার পার্থক্যকে গুরুত্ব দিতে হবে।

2. **জনসংখ্যা ভিত্তিক বাজার বিভাজন** (Demographic Segmentation) : জনসংখ্যা বিষয়ক চলকগুলির উপর ভিত্তি করে বাজার বিভাজন সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। কারণ ভোক্তাদের পছন্দ, চাহিদা এবং ব্যবহারের হার এই চলকগুলির সাথে জড়িত। এছাড়াও এই চলকগুলি সনাক্ত করাও সহজ। সেকারণে বাজার বিভাজনের এটিই সবচেয়ে জনপ্রিয় ভিত্তি। নীচে জনসংখ্যা বিষয়ক চলকগুলি আলোচনা করা হল।

   (i) **বয়স ও জীবনচক্র** (Age and life-cycle) : ক্রেতাদের আকাঙ্ক্ষা, পছন্দ, চাহিদা

ও ক্রয়ক্ষমতা বয়সের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। তাই একজন কিশোর বা যুবকের চাহিদা এবং একজন প্রৌঢ় বা বৃদ্ধের চাহিদার ধরন আলাদা। মানুষের জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে—শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য—চাহিদার পরিবর্তন অত্যন্ত ব্যাপক। তাই জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ের ক্রেতারা এক একটি উপবাজার গড়ে তোলে।

(ii) **লিঙ্গ** (Gender) : লিঙ্গ প্রধানত দু-ধরনের—পুরুষ ও মহিলা। যদিও কিছু তৃতীয় লিঙ্গের মানুষও বাস্তবে দেখতে পাওয়া যায় তবু তাদের সংখ্যা এতই নগণ্য যে তারা আলাদা বাজার গড়ে তুলতে পারে না। কতকগুলি ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদে মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। যেমন, মেয়েরা শাড়ি, সালোয়ার কামিজ ইত্যাদি পরিধান করে। অন্যদিকে পুরুষরা প্যান্ট, শার্ট, ধুতি, পাঞ্জাবি ইত্যাদি পরে। সুতরাং মহিলাদের ব্যবহারযোগ্য পোশাক পরিচ্ছদ, কসমেটিক্স, ম্যাগাজিন ইত্যাদি পুরুষদের থেকে আলাদা। সেকারণেই পুরুষ এবং মহিলারা বাজার বিভাজনের ভিত্তি হিসাবে গণ্য হয়।

(iii) **আয়** (Income) : সমাজে বিভিন্ন আয়ের মানুষ বসবাস করে। তাদের আয় অনুসারে তাদের পছন্দ, প্রয়োজন ও চাহিদা গড়ে ওঠে। কারণ আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন থাকলেই চাহিদা গড়ে ওঠে না। এজন্য প্রয়োজন তাদের ক্রয়ক্ষমতা। অর্থাৎ ক্রয়ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষরাই একটি পণ্যের বাজার গড়ে তোলে। তাই আয়ের উপর ভিত্তি করে বাজার বিভক্তিকরণ বহুদিন ধরে অনুসৃত পদ্ধতি।

(iv) **প্রজন্ম** (Generation) : এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মের জীবনদর্শন, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ইত্যাদির মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। নতুন প্রজন্ম নতুন সময়ের প্রেক্ষাপটে বেড়ে ওঠে যা তাদের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে। এই নতুন সময়ের প্রেক্ষাপট বলতে বোঝায় এই সময়ের গান-বাজনা, সিনেমা, রাজনীতি ও অন্যান্য ঘটনা। এদেরকে এককথায় 'গোষ্ঠীদল' (cohorts) বলা হয়। এরা একই অভিজ্ঞতা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে চায়, এদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ একই ধরনের হয়। তাই সকল বিপণনকারী এদের পছন্দসই পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে সিনেমা-স্টার, গায়ক, সফল খেলোয়াড় ইত্যাদির ছবি বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করে।

(v) **সামাজিক শ্রেণি** (Social class) : সমাজের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণির সহাবস্থান দেখতে পাওয়া যায়। ক্রেতা যে সামাজিক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত থাকে সেই অনুযায়ী তার পছন্দ ও চাহিদার ধরন তৈরি হয়। সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস যেসব বিষয়ে ক্রেতার পছন্দকে প্রভাবিত করে তাদের মধ্যে গাড়ি, পোশাক পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র, বিনোদন, পড়ার

অভ্যাস ইত্যাদি অন্যতম। সেকারণে অনেক কারবারি এবং সামাজিক শ্রেণিকে লক্ষ্য করে বিশেষ ধরনের পণ্য উৎপাদন করে।

3. **মনস্তত্ত্বভিত্তিক বাজার বিভাজন** (Psychographic Segmentation) : যখন ক্রেতাদের সামাজিক শ্রেণি, জীবনশৈলী, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে ক্রেতাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হয় তখন তাকে মনস্তত্ত্বভিত্তিক বাজার বিভাজন বলা হয়। এমনকি একই ভৌগোলিক অঞ্চলের ক্রেতাদের মধ্যেও বিভিন্ন মানসিকতা দেখতে পাওয়া যায়। সেকারণে বিপণনকারীরা প্রায়শই ক্রেতাদের জীবনশৈলী ও মানসিকতাকে ভিত্তি করে বাজার বিভাজন করে এবং সংবেদনশীল বিপণন কৌশল অনুসরণ করে।

4. **আচরণমূলক বাজার বিভাজন** (Behavioural Segmentation) : আচরণমূলক বাজার বিভাজন বলতে বোঝায় যখন ক্রেতাদের জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যবহার ও পণ্যের প্রতি প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে তাদের ছোটো ছোটো গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হয়। অনেক বিপণনকারী মনে করেন যে ক্রেতাদের আচরণের উপর ভিত্তি করে বাজার বিভাজন করা হলে সবচেয়ে ভালো হয়। নীচে বাজার বিভাজনের আচরণমূলক চলকগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হল:

   (i) **উপলক্ষ** (Occassion) : উপলক্ষ হল যে ঘটনা ক্রেতাদের ক্রয়-ইচ্ছাকে জাগ্রত করে বা পণ্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করে। এই উপলক্ষকেও বাজার বিভাজনের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, দুর্গাপূজা, ঈদ, ধনতেরাস, নববর্ষ, বিয়ে, জন্মদিন ইত্যাদি ঘটনা ক্রেতাদের পণ্য ক্রয়ে প্ররোচিত করে। উপলক্ষকে কেন্দ্র করে বাজার বিভাজন পণ্যের ব্যবহার গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

   (ii) **সুবিধা** (Benefit) : পণ্য বা সেবা থেকে ক্রেতারা কী ধরনের সুবিধা চায় তার উপর ভিত্তি করেও বাজার বিভাজন করা হয়। এরূপ বাজার বিভাজনে বিপণনকারী প্রথমেই ক্রেতারা পণ্য থেকে যেসব প্রধান সুবিধা পেতে চায় সেগুলি এবং ক্রেতাদের ধরন সনাক্ত করে। এরপর কোন্ ব্র্যান্ডের পণ্য অনুরূপ সুবিধা প্রদান করতে সমর্থ তা স্থির করে।

   (iii) **ব্যবহারকারীর মর্যাদা** (User status) : অনেক সময় পণ্যের ব্যবহারের উপর নির্ভর করেও বাজারকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাজন করা হয়। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ-বাজার যেসব ক্রেতাদের নিয়ে গড়ে ওঠে সেগুলি হল—'ব্যবহারকারী নয়', 'পূর্বতন ব্যবহারকারী', 'সম্ভাব্য ব্যবহারকারী', 'প্রথম ব্যবহারকারী' ও 'নিয়মিত ব্যবহারকারী'। এরূপ বাজার বিভাজনের ফলে উদ্ভূত 'সম্ভাব্য ব্যবহারকারী' অংশকে লক্ষ্য করে বিপণনকারী তার বিপণন কার্যকলাপ চালায়।

   (iv) **ব্যবহারের হার** (Usage rate) : পণ্য ও সেবা ব্যবহারের হার অনুসারেও বাজারকে

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা হয়। ব্যবহারের হার বলতে বোঝায় **কম**, **মাঝারি**, বা **বেশি** ব্যবহার। কম ব্যবহারকারীর সংখ্যা সাধারণত বেশি হয় কিন্তু মোট ব্যবহার কম হয়। অন্যদিকে বেশি ব্যবহারকারীদের সংখ্যা অল্প কিন্তু মোট ব্যবহার অনেক বেশি হয়। তাই বিপণনকারীরা সাধারণত বেশি ব্যবহারকারী কম সংখ্যক ক্রেতাদের মধ্যে পণ্য বিপণন করতে চায়।

(v) **আনুগত্যের মাত্রা** (Loyalty status) : পণ্য বা সেবার প্রতি ক্রেতাদের আনুগত্যের মাত্রার উপর নির্ভর করে বাজারকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। এগুলি হল **'অনমনীয়'**, **'বিভক্ত'**, **'স্থানান্তরিত'** এবং **'অপসৃত'**। 'অনমনীয় আনুগত্য' যেসব ক্রেতার থাকে তারা সবসময় একই ব্র্যান্ডের পণ্য ক্রয় করে। 'বিভক্ত' আনুগত্যের ক্রেতারা দুটি বা তিনটি ব্র্যান্ডের পণ্য ব্যবহার করে, 'স্থানান্তরিত' ক্রেতারা একটি ব্র্যান্ড ছেড়ে অন্য একটি ব্র্যান্ডের পণ্য ক্রয় করে এবং 'অপসৃত' ক্রেতার কোনো ব্র্যান্ডের পণ্যের প্রতিই আনুগত্য থাকে না।

B ব্যবসায়িক বাজার বিভাজন (Business Market Segmentation)

ক্রেতা বা ভোক্তার বাজার বিভক্তিকরণের ক্ষেত্রে যেসব চলক ব্যবহৃত হয় তাদের মধ্যে কিছু চলক ব্যবসায়িক বাজার বিভক্তকরণের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। এরূপ চলকের উদাহরণ হল—ভৌগোলিক অবস্থান, পণ্যের অন্তর্নিহিত সুবিধা, ব্যবহারের হার ইত্যাদি। এছাড়াও ব্যবসায়িক বাজার বিভাজনে আরও কিছু চলককে ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা হয়, যেমন—ক্রিয়াশীল চলকসমূহ (operating), পরিস্থিতিগত বিষয়সমূহ (Situational factors), ক্রয়-দৃষ্টিভঙ্গি (Purchasing approach), ব্যক্তিক চরিত্রাবলি (personal traits)। তবে এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল জনসংখ্যা বিষয়ক চলকসমূহ। ব্যবসায়িক বাজার বিভাজনের ক্ষেত্রে বিপণনকারীকে প্রথমেই স্থির করতে হয় যে কোন্ শিল্পের জন্য পণ্য বিপণন করা হবে। এরপর ওই শিল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন কোম্পানির আকার বা আকৃতি, ব্যবহারের পরিমাপ, ব্যবহারের হার ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে ছোটো ছোটো অংশ-বাজার গড়ে তোলা হয়।

২.৭ বাজার বিভাজনের ভিত্তি নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ (Factors Influencing Choice of Base)

বাজার বিভাজনের ভিত্তি নির্বাচনে যেসব বিষয় বিবেচনা করতে হয় সেগুলি নিচে তুলে ধরা হল।

(i) **সহজগম্য** (Easy access) : বাজার বিভাজনের ভিত্তি এরূপ হওয়া উচিত যাতে বিপণনকারী সহজেই বিভাজিত এক বা একাধিক বাজারে তার বিপণন কার্যকলাপ চালাতে পারে।

একটি কার্যকর বাজার বিভাজনের ভিত্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে পণ্য বা সেবার **সহজগম্যতা** হল পূর্বশর্ত। এখানে সহজগম্যতা হল যাতে বিপণনকারী বিভিন্ন অংশ-বাজারে তার পণ্যের প্রসার ও বণ্টন সহজেই করতে পারে।

(ii) **সারবত্তা** (Substantiality) : সারবত্তা বলতে বোঝায় বাজার বিভাজনের ফলে যে ছোটো ছোটো বাজারের সৃষ্টি হয় সেগুলি যেন যুক্তিসঙ্গতভাবে বড় হয়। অন্যথায় বাজারগুলিতে বিপণন কার্যকলাপ চালানো অলাভজনক হয়ে পড়ে। অর্থাৎ সারবত্তা হল অংশ-বাজার এমন আকৃতির হবে যেন সেগুলি লক্ষ্য-বাজার হিসাবে গণ্য হতে পারে এবং বিপণনের ক্ষেত্রে লাভজনক হয়।

(iii) **পরিমাপযোগ্যতা** (Measurability) : বাজার বিভাজন তখনই ফলপ্রসূ হয় যখন অংশ-বাজার গুলির আকৃতি ও ক্রয়ক্ষমতা সনাক্ত করা ও পরিমাপ করা সম্ভব হয়। এছাড়াও বিভিন্ন অংশ-বাজারের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক অংশ-বাজারের অন্তর্ভুক্ত ক্রেতাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য দ্বারা যেন সহজেই সনাক্ত করা যায়। অন্যথায় বিক্রয়-প্রসার কার্যকলাপ সঠিকভাবে প্রয়োগ করা দুরূহ হয়ে পড়ে।

(iv) **সম্পাদনযোগ্যতা** (Actionability) : এর অর্থ হল বাজার বিভাজন এমনভাবে হওয়া উচিত যাতে বিপণনকারীর পরিষেবা প্রদানের যোগ্যতার সাথে সাযুজ্য থাকে। অর্থাৎ বিপণনকারী তার কর্মসম্পাদন যোগ্যতা অনুসারে বাজারকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করবে।

(v) **চাহিদার পরিবর্তনশীলতা** (Variation in demand) : বাজার বিভাজন তখনই ফলপ্রসূ হয় যখন বাজারে চাহিদার পরিবর্তনশীলতা অত্যন্ত প্রকট ও ধারাবাহিক হয়। স্থির চাহিদার বাজারে বিভাজন-কৌশল খুব বেশি ফলপ্রসূ হয় না। সুতরাং বাজার বিভাজনের ভিত্তি নির্বাচনে বাজারে চাহিদার পরিবর্তনশীলতার বিষয়টিও বিবেচনা করা উচিত।

(vi) **প্রতিক্রিয়াশীলতা** (Responsiveness) : বাজার বিভাজনের ফলে উদ্ভূত অংশ-বাজার এমন হওয়া উচিত যাতে বিপণন মিশ্রণের সামান্য পরিবর্তন ক্রেতাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং একটি কার্যকরী অংশ-বাজারের যাতে বিভিন্ন বিপণন চলকের প্রতি প্রতিক্রিয়া বজায় থাকে তাও বাজার বিভাজনের ভিত্তি নির্বাচনের সময় বিবেচনা করতে হয়।

(vii) **কার্যকরী কর্মসূচি প্রণয়ন** (Formulation of effective programme) : বাজার বিভাজন তখনই সার্থক হয় যখন অংশ বাজারের জন্য পৃথক কার্যকরী বিপণন কর্মসূচি প্রণয়ন করা সম্ভব হয় এবং যা ক্রেতাদের আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। সুতরাং বাজার বিভাজনের ভিত্তি নির্বাচনে এই বিষয়টিও বিপণনকারীকে বিবেচনার মধ্যে রাখতে হয়।

২.৮ পণ্য পৃথকীকরণ (Product Differentiation)

অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রের মতে পণ্য পার্থক্যকরণ বা পণ্য পৃথকীকরণ হল এমন একটি প্রক্রিয়া যা অন্য কোনো পণ্যের থেকে কোনো একটি পণ্যকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে। কোনো পণ্যের বিপণনের (Unique Selling Point) সাধারণত তার পণ্য পৃথকীকরণের মূল ভিত্তি বলে গণ্য হয়।

বিপণনে পণ্য পৃথকীকরণ খুব বেশি দেখা যায়। কোনো পণ্যকে তার সমজাতীয় পণ্য থেকে আলাদা করার জন্য এই প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়। একটি পূর্ণাঙ্গ বাজারে একটি প্রতিষ্ঠান তার প্রায় সমজাতীয় দুটি পণ্যের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য এই প্রক্রিয়া গ্রহণ করে থাকে।

পণ্য বা সেবার বিপণনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি সমজাতীয় পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলি বিপণন কৌশল হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। পণ্য পৃথকীকরণ বিপণন কৌশলে কোনো বিশেষ পণ্য বা সেবা তার সমজাতীয় পণ্যের থেকে যে বিশেষ পার্থক্য থাকে সেই পার্থক্যের বা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের বিপণন। এই ক্ষেত্রে কোনো কুশলী বিপণন ব্যবস্থাপক তার প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের যে বিশেষ চিত্র সম্ভাব্য ক্রেতার কাছে তুলে ধরে তা ওই পণ্যের বিজ্ঞাপন হিসাবে কাজ করে। ক্রেতার তৃপ্তি এবং সন্তুষ্টির স্তর এর ফলে বৃদ্ধি পায় এবং ক্রেতার মনে সেই পণ্যের প্রতি একধরনের আনুগত্যের সৃষ্টি হয় (brand loyalty)। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্যই ক্রেতা সেই পণ্যটি পেতে ইচ্ছুক হয়।

পণ্য পৃথকীকরণ অনেকাংশে কোনো পণ্য, কোনো সেবা বা উভয়েরই উপযুক্ত বিজ্ঞাপন হিসাবে কাজ করে। পণ্যটি সেই পণ্য যা ক্রেতার বিশেষ বিক্রয়যোগ্য প্রস্তাবকে (USP) ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেয়। এর ফলে পণ্যটির ক্রেতা বা সম্ভাব্য ক্রেতা পণ্যটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয় এবং পণ্যটির বিক্রয় বৃদ্ধি পায়।

কোনো প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত পণ্য পৃথকীকরণ নীতি গ্রহণ করলে পণ্যের একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার তৈরি হয় এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারেও এই পদ্ধতি সাফল্য লাভ করে যদি সেই পণ্যের বিকল্প সমজাতীয় পণ্যসমূহও বাজারে থাকে। পণ্য পৃথকীকরণ সাধারণত তিন ধরনের হয় :

(1) সাধারণ পৃথকীকরণ—যাতে সেই পণ্যের সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে বিজ্ঞাপনে তুলে ধরা হয়।

(2) অনুভূমিক পৃথকীকরণ—যাতে সেই পণ্যের কোনো একটি **বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে** বিজ্ঞাপনে তুলে ধরা হয়।

(3) সমান্তরাল পৃথকীকরণ—যাতে একই ধরনের পণ্যের মধ্যে তুলনায় কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠানের পণ্যের গুণগত মানকে তুলে ধরা হয়।

পণ্য পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞাতকরণও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সমজাতীয় পণ্য যেমন সাবান, দাঁতের মাজন, সিগারেট ইত্যাদির ক্ষেত্রে এরূপ পৃথকীকরণ খুব বেশি দেখা যায়। প্যাকেজিং বা মোড়কজাতকরণ বা বিজ্ঞাপনের উপরও পণ্য পৃথকীকরণ নির্ভর করে। অল্পবয়সী মহিলারা সাধারণত

রঙিন মোড়ক বেশি পছন্দ করে। পণ্যের মোড়কজাতকরণ যথার্থ হলে তার প্রভাব ক্রেতাদের উপর পড়ে।

আবার বিজ্ঞাপন কৌশলের উপরেও পণ্য পৃথকীকরণ নির্ভর করে।

❑ পণ্য পৃথকীকরণের উৎসসমূহ

(i) ক্রেতার পছন্দ—অনেকসময় কিছু ক্রেতা পণ্যের উপযোগিতা বা গুণমান না দেখে তার ব্র্যান্ড দেখে পণ্য কেনে। যেমন—নরম পানীয়ের ক্ষেত্রে সমস্ত নরম পানীয়ই প্রায় সমান কিন্তু কোনো ক্রেতা পেপ্‌সি আবার কেউ 'থাম্‌স আপ' বা 'লিমকা' পছন্দ করে।

(ii) বিপণন দক্ষতা—একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অনেক ক্রেতা সাধারণত যে পণ্যের বিজ্ঞাপন বা চাকচিক্য বেশি তাতে আকৃষ্ট হয়। এরূপক্ষেত্রে পণ্য বা সেবা সমজাতীয় হলেও বিপণন দক্ষতার উপর ভিত্তি করে তারা পৃথক হয়ে যায়।

২.৯ বাজার বিভক্তিকরণ ও পণ্য পৃথকীকরণের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Market Segmentation and Product Differentiation)

বাজার বিভক্তিকরণ ও পণ্য পৃথকীকরণের মধ্যে যেসব পার্থক্য বিদ্যমান সেগুলি নীচে তালিকাকারে তুলে ধরা হল।

ভিত্তি	বাজার বিভক্তিকরণ	পণ্য পৃথকীকরণ
1. ভিত্তি	বৃহত্তর বাজারকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত ক্রেতাদের নিয়ে যে ছোটো ছোটো বাজার গড়ে তোলার প্রক্রিয়া। সুতরাং বৃহত্তর বাজার হল বাজার বিভাজনের ভিত্তি।	বিপণনকারীর উৎপাদিত পণ্য হল এর ভিত্তি। পণ্য পৃথকীকরণের মূল ভিত্তি হল পণ্যের বিপণনের USP (Unique selling point)।
2. উদ্দেশ্য	বাজার বিভাজনের বা বিভক্তিকরণের উদ্দেশ্য হল বর্তমান ও সম্ভাব্য ক্রেতাগোষ্ঠীকে সনাক্ত করা ও তাদেরকে সন্তুষ্ট করা।	পণ্য পৃথকীকরণের উদ্দেশ্য হল পণ্যের বাজার বৃদ্ধি করা এবং বেশি সংখ্যক ক্রেতার কাছে পণ্য পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা।
3. ধরন	বাজার বিভাজন মূলত **চার ধরনের**। এগুলি হল—ভৌগোলিক বিভাজন, জনসংখ্যা ভিত্তিক বিভাজন, মনস্তাত্ত্বিক বিভাজন ও আচরণভিত্তিক বিভাজন।	অন্যদিকে পণ্য পৃথকীকরণ **তিন ধরনের**। এগুলি হল—সাধারণ পৃথকীকরণ, অনুভূমিক পৃথকীকরণ ও সমান্তরাল পৃথকীকরণ।

ভিত্তি	বাজার বিভক্তিকরণ	পণ্য পৃথকীকরণ
4. পরিধি	বাজার বিভাজনের পরিধি অনুপাতিকভাবে ব্যাপক। পণ্যের সামগ্রিক বাজারকে কেন্দ্র করে বাজার বিভাজন আবর্তিত হয়।	পণ্য পৃথকীকরণ অনুপাতিকভাবে সংকীর্ণ পরিধিতে কাজ করে। বিপণনকারীর সমজাতীয় পণ্যের মধ্যে আলাদা বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরার মধ্যে এর কার্যকলাপের পরিধি আবর্তিত হয়।
5. নির্ভরতা	বাজার বিভক্তিকরণ পণ্য পৃথকীকরণের উপর নির্ভরশীল নয়। এটি বৃহত্তর বাজারের ক্রেতাগোষ্ঠীর উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে।	পণ্য পৃথকীকরণ বাজার বৃদ্ধি বিভাজনের উপর বেশি নির্ভরশীল। বাজারের চরিত্র অনুযায়ী পণ্যের পৃথকীকরণ করা হয়।
6. সুফল	বাজার বিভাজনের অনেক সুফল পাওয়া যায়। এর দ্বারা ক্রেতা সন্তুষ্টি, ব্যয় সংকোচ, উন্নত পরিষেবা, প্রতিযোগিতার মোকাবিলা, নিবিড় ক্রেতা সম্পর্ক ইত্যাদি সুফল পাওয়া সম্ভব হয়।	পণ্য পৃথকীকরণ থেকে ক্রেতা সন্তুষ্টি, উন্নত পরিবেশ, বিক্রয় বৃদ্ধি, প্রতিযোগিতার মোকাবিলা ইত্যাদি সুবিধা পাওয়া যায়।

২.১০ সারাংশ

কোনো পণ্য বা সেবার বাজার গড়ে ওঠে বিভিন্ন ক্রয়ক্ষমতা সম্পন্ন ক্রেতাদের নিয়ে। সকল ক্রেতার পছন্দ ও চাহিদা যেমন এক নয়, তেমনি তাদের ক্রয়ক্ষমতাও এক নয়। সুতরাং পণ্যের বৃহত্তর বাজারের মধ্যে বিভিন্ন ক্রয়ক্ষমতা সম্পন্ন ক্রেতাদের নিয়ে ওই পণ্য বা সেবার কতকগুলি উপবাজার গড়ে ওঠে এবং বাজার বিভাজন হল এই উপবাজারগুলির সনাক্তকরণ। এর মাধ্যমে ক্রেতা সন্তুষ্টি, ব্যয় সংকোচ, উন্নত পরিষেবা, নিবিড় ক্রেতা সম্পর্ক ইত্যাদি গড়ে ওঠে যার ফলে সামগ্রিকভাবে ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সকলেরই সুবিধা হয়। এই বিষয়ে আলোকপাত করার ক্ষেত্রে বাজার বিভাজনের ভিত্তিসমূহ যেমন আলোচনা করা হয়েছে, তেমনি পণ্য পৃথকীকরণ ও পণ্য পৃথকীকরণের উৎসসমূহের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

২.১১ অনুশীলনী

ক) বহুপছন্দ ভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। উদ্দিষ্ট বা লক্ষ্য বাজারের ক্রেতাদের মধ্যে যেসব মিল দেখা যায় নিম্নলিখিত কোন্ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি তার অন্তর্ভুক্ত নয়?

ক) ক্রয়ের পরিমাণ খ) প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা

গ) ক্রয় ক্ষমতা ঘ) ক্রয়ের ধরণ

২। নিম্নলিখিত কোন্‌টি জনসংখ্যা ভিত্তিক বাজার বিভাজনের অন্তর্ভুক্ত নয়?

ক) বয়স ও জীবনচক্র খ) ব্যক্তিত্ব

গ) লিঙ্গ ঘ) আয়

৩। ভোক্তার বাজার বিভাজনের মধ্যে নিচের কোন ভিত্তিটি সম্পর্কিত নয়?

ক) ভৌগোলিক ভিত্তি খ) জনসংখ্যামূলক ভিত্তি

গ) ব্যয়-সংকোচ ভিত্তি ঘ) সামাজিক ভিত্তি

৪। _________ এমন এক প্রক্রিয়া যা সমজাতীয় অন্যান্য পণ্যের থেকে কোনো পণ্যকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে।

ক) ভোক্তা পৃথকীকরণ খ) বাজার পৃথকীকরণ

গ) বিক্রেতা পৃথকীকরণ ঘ) পণ্য পৃথকীকরণ

৫। নিম্নলিখিত কোন্‌টি পণ্য পৃথকীকরণের ধরণ হিসাবে বিবেচিত হয় না?

ক) সাধারণ পৃথকীকরণ খ) বৃত্তাকার পৃথকীকরণ

গ) অনুভূমিক পৃথকীকরণ ঘ) সমান্তরাল পৃথকীকরণ

খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

১। বাজার বিভাজন সম্পর্কে ধারণা দিন।

২। লক্ষ্য বাজার কাকে বলে?

৩। বাজার বিভাজনের দুটি গুরুত্ব উল্লেখ করুন।

৪। জনসংখ্যা ভিত্তিক বাজার বিভাজনের দুটি চলক কী কী?

৫। ব্যবসায়িক বাজার বিভাজন কাকে বলে?

৬। বাজার বিভাজনের ভিত্তি নির্বাচনে দুটি বিবেচ্য বিষয় কী কী?

৭। পণ্য পৃথকীকরণ বলতে কী বোঝায়?

গ) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

১। বাজার বিভাজনের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। ভোক্তার বাজার বিভাজনের ভিত্তিসমূহ আলোচনা করুন।

৩। বাজার বিভাজনের ভিত্তি নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। বাজার বিভাজনে কাকে বলে? পণ্য পৃথকীকরণ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫। পণ্য পৃথকীকরণ কী? বাজার বিভক্তিকরণ ও পণ্য পৃথকীকরণের মধ্যে পার্থক্য কী কী?

একক ৩ ❑ পণ্য ও পণ্যের দাম (Product and Pricing of Product)

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য
৩.২ প্রস্তাবনা
৩.৩ পণ্য – ধারণা
৩.৪ পণ্যের গুরুত্ব
৩.৫ পণ্যের বৈশিষ্ট্য
৩.৬ পণ্য পরিকল্পনা
৩.৭ পণ্যের জীবনচক্র বা আয়ুষ্কাল চক্র
৩.৮ পণ্যের দাম নির্ধারণ – অর্থ
৩.৯ মূল্য নির্ধারণের ভিত্তিসমূহ
৩.১০ পণ্যের দাম নির্ধারণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ
৩.১১ পণ্য-মূল্য বা দাম নির্ধারণের নীতিসমূহ
৩.১২ সারাংশ
৩.১৩ অনুশীলনী

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি থেকে আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অবহিত হবেন—

- পণ্য সম্পর্কে ধারণা
- পণ্যের গুরুত্ব
- পণ্যের বৈশিষ্ট্য
- পণ্য পরিকল্পনা
- পণ্যের জীবনচক্র বা আয়ুষ্কাল চক্র
- পণ্যের দাম নির্ধারণের অর্থ
- মূল্য নির্ধারণের ভিত্তিসমূহ

- পণ্যের দাম নির্ধারণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ
- পণ্যমূল্য বা দাম নির্ধারণের নীতিসমূহ

৩.২ প্রস্তাবনা

বিপণন কার্যকলাপের মূল উপাদান হল পণ্য বা সেবা। পণ্যকে কেন্দ্র করেই বিপণনের কার্যকলাপ আবর্তিত হয়। সাধারণ অর্থে ক্রেতা অর্থের বিনিময়ে যা কিছু পায় তাকেই পণ্য বলে। পণ্য বা সেবার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি ঘটে ও সমাজে সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারী হিসাবে প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি ঘটে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের চাহিদা, রুচি, পছন্দ ইত্যাদিরও পরিবর্তন হয়। সেজন্য কোনো পণ্যের চাহিদা কোনো এক সময়ে বেশি দেখা যায়, আবার পরবর্তী সময়ে ওই পণ্যই তার গ্রহণযোগ্যতা হারায়। সুতরাং প্রতিটি পণ্যের একটি আয়ুষ্কাল থাকে। এই আয়ুষ্কাল পণ্যের উপস্থাপন স্তর থেকে শুরু হয় ও ক্ষয়িষ্ণু স্তরে গিয়ে পৌঁছায়। পণ্যের আয়ুষ্কালের সাথে সাথে পণ্যের দাম বিষয়টিও প্রাসঙ্গিক। বিপণন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পণ্যের দাম নির্ধারণ একটি সংকটপূর্ণ ক্ষেত্র। দাম নির্ধারণে ত্রুটি থাকলে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সফল হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেজন্য পণ্যের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। সুতরাং পণ্য ও পণ্যের দাম সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে এই একক থেকে প্রয়োজনীয় ধারণা পাওয়া যাবে।

৩.৩ পণ্য—ধারণা (Product — Concept)

বিপণন কার্যকলাপের মূল উপাদান হল পণ্য বা সেবা। পণ্যকে কেন্দ্র করেই বিপণনের কার্যকলাপ আবর্তিত হয়। সাধারণ অর্থে পণ্য বলতে বোঝায়—'ক্রেতা অর্থের বিনিময়ে যা কিছু পায় তাকেই বলে পণ্য'। প্রযুক্তি ও উৎপাদনের দিক থেকে পণ্যের যে সংজ্ঞা পাওয়া যায়, তা হল—'উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন কাঁচামাল একত্রিত করে যে বস্তু ভোগের জন্য উৎপাদিত হয়, তাই হল পণ্য'। অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পণ্য বলতে বোঝায় 'যার মধ্যে একগুচ্ছ উপযোগিতা বর্তমান থাকে এবং যার সেবা প্রদানের ক্ষমতা থাকে। এই উপযোগিতা কতকগুলি স্পর্শনীয়, ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলির সমন্বয়ে সহজে চিহ্নিত করা যায় এরূপ আকারে গড়ে ওঠে।' বস্তু বা সেবার দ্বারা মানুষ তাদের আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন মেটায়। সেজন্য প্রাথমিকভাবে **পণ্য বলতে বস্তু** ও **সেবা** উভয়কেই বোঝায়।

Kotler পণ্যের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা হল—'প্রয়োজন বা আকাঙ্ক্ষা মেটানোর জন্য যা কিছু প্রস্তাব করা যায় তাকেই বলে পণ্য' *(...anything that can be offered to satisfy a need or want)*। একটি বস্তুগত পণ্যের গুরুত্ব পণ্যের আকার ও আয়তনের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে

তার সেবা প্রদানের ক্ষমতার উপর। প্রকৃতপক্ষে পণ্য হল সেই বস্তু যা থেকে সেবা প্রবাহিত হয় ও মানুষের প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ হয়।

পণ্যের ধারণা মূলত **ত্রিমাত্রিক** এবং এর প্রতিটি মাত্রা ক্রেতার পণ্য সংক্রান্ত উপযোগিতার ধারণা থেকে গড়ে উঠেছে। যে-কোনো পণ্যের এই তিনটি মাত্রা হল—**এটি বস্তুগত পণ্য, এটি বর্ধিত পণ্য** ও **এটি সাধারণ গুণসম্পন্ন পণ্য**। উদাহরণস্বরূপ রেফ্রিজারেটর একটি বস্তুগত পণ্য। এর উপাদানগুলি হল রং, নকসা, গুণগত মান, আকার, ওজন, বৈশিষ্ট্য, শক্তির উৎস, ব্র্যান্ড ইত্যাদি। বর্ধিত পণ্য হিসাবে এর উপাদানগুলি হল—ভাবমূর্তি, গ্যারেন্টি, সংস্থাপন, বিক্রয় পরবর্তী পরিষেবা, যন্ত্রাংশ ইত্যাদি। সাধারণ পণ্য হিসাবে এর উপাদানগুলি হল খাদ্য সামগ্রীর সংরক্ষণ, মজুতকরণ, ঠাণ্ডা করার ক্ষমতা ইত্যাদি।

৩.৪ পণ্যের গুরুত্ব (Importance of Product)

পণ্য ও সেবা হল বিপণনের কেন্দ্রবিন্দু। এদের কেন্দ্র করেই বিপণন-সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজ আবর্তিত হয়। বস্তুত কেবল বিপণন নয়, সমগ্র প্রতিষ্ঠানেরই কার্যকলাপ পণ্য বা সেবাকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়। পণ্য বা সেবার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি ঘটে, সমাজে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে। সেজন্য বিপণনের সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানেও পণ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। এর কয়েকটি বিশেষ গুরুত্ব নীচে আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরা হল।

1. **পণ্য প্রতিষ্ঠানকে সচল রাখে** (Product keeps the organisation moving) : প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই বিশেষ কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নিয়ে স্থাপিত হয়। এই উদ্দেশ্য হল পণ্য বা সেবার উৎপাদন, বিপণন ও এ-সবের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন। পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জিত হলে উৎপাদন প্রক্রিয়া সচল থাকে। পণ্য বিক্রয়ে সাফল্যের জন্য বিপণন কার্যকলাপ গ্রহণ করা হয়। আর বিপণন কার্যকলাপ হল প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কার্যকলাপের অংশবিশেষ। সুতরাং পণ্যই প্রতিষ্ঠানকে সচল রাখতে ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
2. **পণ্য ছাড়া বিপণন অসম্ভব** (Marketing is impossible without product) : বিপণন একটি জটিল ও ব্যাপক প্রক্রিয়া। বিপণন গড়ে ওঠে পণ্যকে কেন্দ্র করেই। পণ্যের অস্তিত্ব ছাড়া বিপণন কল্পনা করা যায় না। কারণ পণ্য বিপণনের মাধ্যমেই বিপণনের উদ্দেশ্য তথা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সফল হয়।
3. **পণ্য বিপণন মিশ্রণের প্রধান উপাদান** (Principle element of marketing mix) : বিপণনের উদ্দেশ্য সার্থক করার জন্য প্রতিষ্ঠান তার বিপণন-মিশ্রণ গড়ে তোলে। এটি হল বিপণনের

বিভিন্ন উপাদানের মিশ্রণ এবং একটি কার্যকরী কৌশল যা বিপণনের মূল লক্ষ্য পূরণ সহজ করে। আর এই মিশ্রণের প্রধান উপাদান হল—পণ্য।

4. **পণ্য—ক্রেতার চাহিদা পূরণের মাধ্যম** (Product—a medium of customers' demand satisfaction) : মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন আছে বলেই পণ্যের উৎপাদন ও বিপণেনর উদ্ভব ঘটেছে। কারণ মানুষ চাহিদা ও প্রয়োজন মেটায় পণ্যের মাধ্যমেই। ক্রেতা তার প্রয়োজনীয় পণ্যের সন্ধান করে, ক্রয় করে এবং ভোগ করে নিজের প্রয়োজন মেটায় ও সন্তুষ্ট হয়। এভাবেই পণ্যের বাজার গড়ে ওঠে। আর বাজারের এই চাহিদা মেটানোর জন্যই উৎপাদক চাহিদা মেটানোর উপযোগী পণ্য উৎপাদন করে, বিপণনের মাধ্যমে পণ্যের যোগান সুনিশ্চিত করে ও বিক্রয়ের মাধ্যমে চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করে। বস্তুত বিপণন তথা কারবারি কার্যকলাপ ক্রেতার চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যেই সংগঠিত হয়।

5. **পণ্যের সামাজিক গুরুত্ব** (Social importance of product) : পণ্যের গুরুত্ব কেবল কারবারি ক্ষেত্রেই স্বীকৃতি পায় না, সামাজিক ক্ষেত্রেও এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। বস্তুত সমস্ত কার্যকলাপেই—তা ব্যবসায়িক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক বা গবেষণামূলক যাই হোক না কেন—অন্তিম লক্ষ্য হল সমাজ। বিপণনের কাজ হল সমাজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য উপযুক্ত পণ্য ও সেবা যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

৩.৫ পণ্যের বৈশিষ্ট্য (Features of Product)

প্রতিটি উৎপাদিত পণ্যেরই কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে। এই বৈশিষ্ট্যগুলিই ক্রেতাকে আকর্ষণ করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি থাকে বলেই পণ্যের বাজার গড়ে ওঠে। বিভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে যেসব বৈশিষ্ট্য দেখা যায় সেগুলি হল—

1. **বস্তু বা অবস্তুগত** (Tangible or Intangible) : পণ্য বস্তুগত বা অবস্তুগত উভয় প্রকারের হতে পারে। তবে বেশিরভাগ পণ্যই বস্তুগত অর্থাৎ যাদের আকার, আয়তন, ভর ইত্যাদি আছে। অন্যদিকে 'সেবা' হল অবস্তুগত পণ্য।

2. **উপযোগিতা** (Utility) : পণ্যের মধ্যে উপযোগিতা থাকতেই হবে। কারণ পণ্য হল উপযোগিতার সম্মিলিত রূপ। পণ্যের উপযোগিতাই ক্রেতাদের প্রয়োজন, আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা মেটাতে পারে। উপযোগিতা নেই এরূপ পণ্য উৎপাদিত হয় না কারণ এ ধরনের পণ্য কেউ ক্রয় করে না।

3. **ক্রেতার প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা** (Capable to meet the need of buyers) : পণ্যের উপযোগিতা থাকলেও তার কার্যকারিতা না থাকলে ক্রেতার প্রয়োজন মেটাতে পারে না।

অর্থাৎ পণ্যের উপযোগিতার সাথে সাথে পণ্যের কার্যকারিতাও এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই দুইয়ের মিলিত প্রয়াসে ক্রেতার প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা পণ্যের মধ্যে গড়ে ওঠে। আর এই প্রয়োজন মেটানোর মাধ্যমেই পণ্যটি ক্রেতাকে সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত করে।

4. **সেবার প্রবাহ** (Flow of service) : পণ্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এর থেকে সেবা-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। এই সেবার প্রবাহই ক্রেতার প্রয়োজন মেটায় ও তাকে সন্তুষ্ট করে। প্রকৃতপক্ষে ক্রেতা পণ্য কেনে না, সেবা-প্রবাহের উৎস কেনে।

5. **বিনিময়যোগ্যতা** (Exchangeability) : পণ্যকে কেন্দ্র করেই বিনিময় সংঘটিত হয়, লেনদেন গড়ে ওঠে। পণ্য না থাকলে বিনিময় গড়ে উঠত না, পণ্য বিপণন তথা বিক্রয়েরও প্রশ্ন উঠত না। অর্থাৎ বিনিময়যোগ্যতা পণ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

6. **মুনাফাযোগ্যতা** (Profitability) : পণ্য বিপণনের দুটি প্রধান লক্ষ্য হল—ক্রেতার তৃপ্তিসাধন ও মুনাফার সর্বাধিকীকরণ। সুতরাং পণ্যের মধ্যে মুনাফাযোগ্যতা থাকতেই হবে। পণ্যের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য না থাকলে পণ্যের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। কারণ মুনাফা ছাড়া প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব রক্ষা করা অসম্ভব। মুনাফাযোগ্যতা আসলে পণ্যের মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা। এই ক্ষমতাই উৎপাদককে পণ্য উৎপাদনে উৎসাহ যোগায়।

৩.৬ পণ্য পরিকল্পনা (Product Planning)

পণ্য পরিকল্পনা হল পণ্য উৎপাদনের আগের স্তর। উৎপাদক যখন কোনো চালু পণ্যের উন্নয়ন ঘটাতে চায় বা কোনো নতুন পণ্য বাজারে চালু করতে চায় তখন যে পরিকল্পনা করা হয় তাকেই পণ্য পরিকল্পনা বলে। পণ্য পরিকল্পনা সাধারণত উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপনার কাজ। কেবলমাত্র বিপণন ব্যবস্থাপক এই পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে না। পণ্য পরিকল্পনায় সাধারণত বিপণন ব্যবস্থাপকের সাথে উৎপাদন ব্যবস্থাপক, ক্রয় ব্যবস্থাপক, অর্থ ব্যবস্থাপক ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় যুক্ত আধিকারিকরা থাকে। পণ্য পরিকল্পনা করার আগে সম্ভাব্য পণ্য সংক্রান্ত একটি বাজার গবেষণা চালানো হয় এবং গবেষণার ফল পণ্য পরিকল্পনার ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।

পণ্য পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যেসব বিষয় গুরুত্ব পায় সেগুলি হল নিম্নরূপ :

(i) **পণ্যের নক্সা সংক্রান্ত পরিকল্পনা** (Planning in respect of design of product) : পণ্যের নক্সা পরিকল্পনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। সাধারণত প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তিবিদ ও গবেষকরা পণ্যের নক্সা চূড়ান্ত করেন ও পরিকল্পনা কমিটির অনুমোদনের জন্য পেশ করেন। পণ্যের নক্সা হল পণ্যের গঠনগত দিক অর্থাৎ কী কী কাঁচামাল ব্যবহৃত হবে, পণ্যের আকার বা আকৃতি, পণ্যের রং, পণ্যের ওজন ইত্যাদি।

(ii) **পণ্য উপস্থাপনের সময় সংক্রান্ত পরিকল্পনা** (Planning regarding time of introduction): পণ্যের বিপণন সাফল্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পণ্যটি বাজারে উপস্থাপন করার সময়। কারণ অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে অনেক ভালো পণ্যও ঠিক সময়ে বাজারে উপস্থাপন করতে না পারার কারণে ক্রেতাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। সুতরাং বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করে সম্ভাব্য পণ্যের বাজারে উপস্থাপন সময় সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়।

(iii) **পণ্যের উৎপাদন সংক্রান্ত পরিকল্পনা** (Planning for production): পণ্যের নক্সা সংক্রান্ত পরিকল্পনা চূড়ান্ত হলে পণ্যটি উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হয়। পণ্যের উৎপাদন কার্যসূচি আবার নির্ভর করে পণ্যটি বাজারে কখন ছাড়া হবে তার উপর। পণ্য উৎপাদনের জন্য সঙ্কটজনক পথ পদ্ধতি (CPM—Critical Path Method) তৈরি ও বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিভিন্ন বিকল্প পথের মধ্য থেকে সঠিক পথটি উৎপাদনের জন্য বেছে নেওয়া হয়।

(iv) **অর্থসংস্থান সংক্রান্ত পরিকল্পনা** (Planning for financing): নতুন পণ্য বা পণ্যের উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। অর্থসংস্থান পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হল—পণ্যের সম্ভাব্য উৎপাদন ব্যয়, সম্ভাব্য ব্যয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের উৎস, পণ্যের সমভঙ্গ বিন্দু (Break Even Point), পে-ব্যাক পিরিয়ড অর্থাৎ কত বৎসরের মধ্যে লগ্নিকৃত অর্থ ফেরৎ পাওয়ার সম্ভাবনা এবং মুনাফাযোগ্যতা।

(v) **পণ্য বিপণন সংক্রান্ত পরিকল্পনা** (Planning relating to marketing): পণ্য পরিকল্পনার জন্য গঠিত কমিটি পণ্য পরিকল্পনার অংশ হিসাবে শেষ যে সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করে তা হল পণ্য বিপণন সংক্রান্ত পরিকল্পনার একটি রূপরেখা তৈরি করা। এই পরিকল্পনায় পণ্যের দাম, প্রসার ও বণ্টন সংক্রান্ত কিছু গাইডলাইন বিপণন ব্যবস্থাপককে দেওয়া হয়।

পণ্য পরিকল্পনা বলতে মূলত বোঝায় সম্ভাব্য পণ্যের আকার, আকৃতি, রং, গন্ধ, রূপ ইত্যাদি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বা কোনো প্রচলিত পণ্যের মধ্যে নতুন উপযোগিতা যুক্ত করার সিদ্ধান্ত।

৩.৭ পণ্যের জীবনচক্র বা আয়ুষ্কাল চক্র (Product life cycle)

দার্শনিকেরা বলেন এ পৃথিবীতে সব কিছুই নশ্বর। অর্থাৎ কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। মানুষ মরণশীল, পণ্যও তাই। কেবলমাত্র জীবেরই যে জীবনচক্র আছে তা ঠিক নয়। জীব ও জড় প্রত্যেকেই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়। তাই প্রত্যেকেরই আয়ুষ্কাল বা জীবনচক্র থাকে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের চাহিদা, রুচি, পছন্দ ইত্যাদিও পরিবর্তিত হয়। সেজন্য কোনো পণ্যের চাহিদা কোনো এক সময়ে খুব বেশি দেখা যায় আবার পরবর্তী কোনো

এক সময়ে ওই পণ্যই বাতিল বলে ঘোষিত হয়। সাধারণভাবে পণ্যের আয়ুষ্কাল বলতে বোঝায়, কোনো পণ্যের উৎপাদন, বণ্টন, বিক্রয়, ক্রেতার তৃপ্তিসাধন থেকে পরিত্যক্ত হওয়া পর্যন্ত সময়কাল। এই আয়ুষ্কাল সাধারণত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এগুলি হল—(1) **প্রযুক্তিগত পরিবর্তন**, (2) **পণ্যের চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা** ও (3) **প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা**।

পণ্যের জীবনচক্র পণ্য সংক্রান্ত যে চারটি বিষয় তুলে ধরে সেগুলি হল—

1. পণ্যের জীবন সীমিত;
2. পণ্য বিক্রয় বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয় এবং প্রতিটি স্তরে বিক্রেতা নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়;
3. পণ্যের জীবনচক্রের বিভিন্ন স্তরে মুনাফার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে;
4. পণ্য জীবনচক্রের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরনের বিপণন কৌশলের প্রয়োজন হয়।

গড় পণ্যের জীবনচক্র একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরলে আমরা যে চিত্র পাই তা হল নিম্নরূপ :

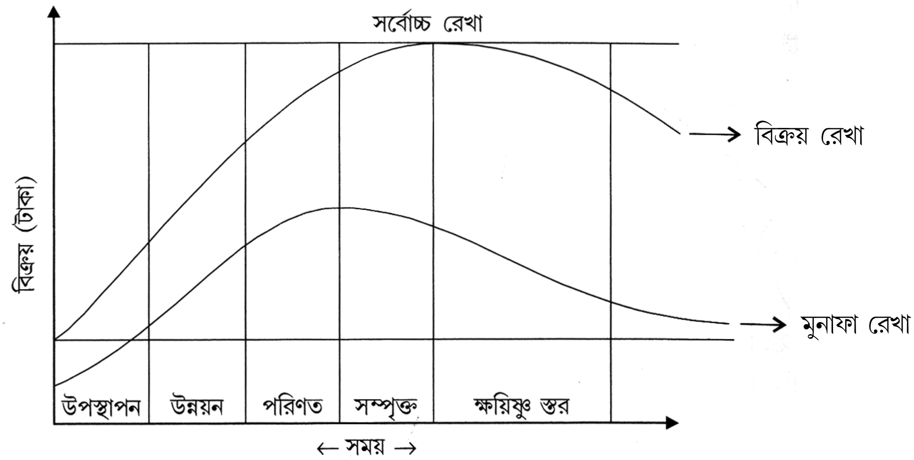

পণ্যের জীবনচক্র রেখা

রেখাচিত্র থেকে দেখা যায় যে পণ্যের জীবনচক্র উপস্থাপন স্তর থেকে শুরু হয় ও ক্ষয়িষ্ণু স্তরে গিয়ে শেষ হয়। এই স্তরে পণ্যটির মৃত্যু ঘটে অর্থাৎ পণ্যটি বাজার থেকে অপসারিত হয়। বিভিন্ন স্তরে পণ্য বিপণনে যেসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় ও যেসব বিপণন কৌশল অনুসরণ করা হয় সেগুলি নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

1. **প্রাথমিক স্তর বা উপস্থাপন স্তর** (Introduction Stage) : এটিই হল পণ্যের জীবনচক্রের প্রাথমিক স্তর এবং এই স্তরটি **'উৎপাদন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন'**-এর পরই শুরু হয়। পণ্য

বাজারে যখন প্রথম প্রবেশ করে তখন থেকেই এই স্তর শুরু হয় এবং উন্নয়ন স্তরে গিয়ে শেষ হয়। নতুন পণ্যের ক্ষেত্রে এই স্তরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পণ্যটি যদি বাজারে তার জায়গা অধিকার করতে না পারে অর্থাৎ পণ্যটিকে যদি ক্রেতারা গ্রহণ না করে তাহলে এই স্তরেই তার মৃত্যু ঘটে।

2. **উন্নয়ন স্তর** (Growth Stage) : এই স্তর পণ্য জীবনচক্রের দ্বিতীয় স্তর। প্রাথমিক স্তরে পণ্যটি ক্রেতাদের দ্বারা গৃহীত হলে পণ্যের বিক্রয়বৃদ্ধি শুরু হয়। বিপণনকারী আশার আলো দেখতে পায়। এই স্তরে পণ্য দ্রুত বিক্রয় হতে শুরু করে ও বিক্রয় বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। এই স্তরে প্রথম প্রতিযোগীদের অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করে, তবে পণ্যকে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হয় না।

3. **পরিণত স্তর** (Matured Stage) : উন্নয়ন স্তর অতিক্রম করে পণ্য পরিণত স্তরে প্রবেশ করে। এই স্তরে পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির হার ক্রমশ কমতে থাকে। কারণ পণ্য তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। এই স্তরে পণ্য বিপণনে বাজার সম্প্রসারণের চেষ্টা না করে বাজার ধরে রাখার দিকেই বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়। এই স্তরের একটি প্রধান কাজ হল প্রতিযোগিতার মোকাবিলা করা। সাধারণত দুর্বল প্রতিযোগীরা এই স্তরেই বাজার ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। ফলে প্রতিযোগীর সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে।

4. **সম্পৃক্ত স্তর** (Saturated Stage) : পণ্যের জীবনচক্রের এই স্তর কারবারিদের কাছে বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। আগের স্তরের থেকেও বিক্রয় বৃদ্ধির হার কমতে থাকে কারণ নতুন কোনো চাহিদার সৃষ্টি হয় না। এই স্তরে বিক্রয়রেখা অনেকটা মালভূমির উপরের অংশের আকার পায় এবং এর ঢাল নিম্নমুখী হয়। বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য বিক্রয় প্রবর্তন কৌশল আর বাজারে বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারে না। পণ্যের দাম কমিয়ে বাজার সম্প্রসারণের চেষ্টা করা হয় কিন্তু তাতেও বিশেষ কোনো সাড়া পাওয়া যায় না।

5. **অবনমন বা ক্ষয়িষ্ণু স্তর** (Decline Stage) : এটিই পণ্যের জীবনচক্রের অন্তিম স্তর। এই স্তরেই পণ্যের মৃত্যু ঘটে এবং পণ্যটি বাজার থেকে অপসৃত হয়। অনেক নতুন পণ্যের ক্ষেত্রে অবশ্য উপস্থাপন স্তরের পরই ক্ষয়িষ্ণু স্তর শুরু হতে দেখা যায় কারণ ক্রেতারা পণ্যটি গ্রহণ করে না। পণ্যের প্রকৃতি অনুসারে এই স্তর কখনো দীর্ঘস্থায়ী ও কখনো স্বল্পস্থায়ী হয়। এই স্তরে চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ফলে তারা বিকল্প পণ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এর ফলে পণ্যের বিক্রয় ক্রমশ কমতে থাকে এবং পণ্য আর সেরকম মুনাফা অর্জন করতে পারে না। পণ্যটি প্রতিষ্ঠানের কাছে আর লাভজনক থাকে না এবং উৎপাদক পণ্যের উৎপাদন বন্ধ করার ব্যবস্থা করে।

৩.৮ পণ্যের দাম নির্ধারণ—অর্থ (Pricing of product—meaning)

বিপণনে পণ্য বিনিময়ের প্রতিদান হিসাবে ক্রেতা বিক্রেতাকে যে মূল্য প্রদান করে তাকেই বলে পণ্যের দাম। পণ্যের দাম নির্ধারণ আর একটি জটিল প্রক্রিয়া। সেজন্য বিপণন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পণ্যের দাম নির্ধারণ একটি সংকটপূর্ণ ক্ষেত্র রূপে গণ্য হয়। বিপণন কৌশলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল দাম নির্ধারণ সংক্রান্ত কৌশল। কারণ দাম নির্ধারণে ত্রুটি থাকলে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সফল হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেজন্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দাম নির্ধারণ আলাদা গুরুত্ব পায়। পণ্যের দাম নির্ধারণের মাধ্যমেই ঠিক হয়ে যায় যে পণ্যের বিপণন সাফল্য সহজ হবে না পণ্যটি সংকটের মধ্যে আবর্তিত হবে। সেজন্য বিপণন কৌশলে পণ্যের দাম নির্ধারণ সর্বাধিক গুরুত্ব পায়।

বিপণনের লক্ষ্য ও প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য পূরণে দাম নির্ধারণের যে ভূমিকা দেখা যায় তা বিপণন মিশ্রণের অন্য কোনো উপাদানের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। বস্তুত পণ্যের দাম প্রতিষ্ঠানের লাভের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। কারণ দাম একদিকে যেমন আয় অর্জনের সাথে যুক্ত, তেমনি বাজারে পণ্যের চাহিদার সাথেও যুক্ত। অর্থাৎ পণ্যের মোট বিক্রয় দামের উপরই নির্ভর করে। আবার মোট বিক্রয়ের উপর প্রতিষ্ঠানের মুনাফা নির্ভর করে। আর এই দুইয়ের উপর নির্ভর করে বিপণন ও প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য পূরণ হয়। পণ্যের দাম নির্ধারণ এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে পণ্যের এমন এক আর্থিক মূল্য স্থির করা হয় যার ফলে একদিকে যেমন প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধন সম্ভব হয়, সাথে সাথে ক্রেতারা পণ্যের মূল্য সম্পর্কে যে ধারণা গড়ে তোলে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। পণ্যের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায়, যে আর্থিক মূল্যে পণ্যটি বিক্রয় করলে প্রতিষ্ঠান ক্ষতির সম্মুখীন হয় না, আবার ক্রেতারা ওই মূল্য দিতে অস্বীকৃত হয় না তাই হল পণ্যের দাম।

৩.৯ দাম বা মূল্য নির্ধারণের ভিত্তিসমূহ (Basis of Pricing)

পণ্যের দাম বা মূল্য নির্ধারণ বিপণন ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ এর উপর অনেকটাই নির্ভর করে। সেজন্য পণ্যের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় এবং কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে দাম স্থির করতে হয়। পণ্যের মূল্য বা দাম যে তিনটি মৌলিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে ঠিক করা হয়, সেগুলি হল—(1) **ব্যয়**, (2) **চাহিদা** ও (3) **বাজার**। দাম নির্ধারণের এই তিনটি বিষয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও পরস্পরের পরিপূরক। এগুলিকে নিম্নোক্তভাবে আলোচনা করা যায় :

1. **ব্যয়-ভিত্তিক দাম নির্ধারণ** (Cost-based Pricing) : এই পদ্ধতিতে মোট উৎপাদন ব্যয়ের উপর প্রয়োজনীয় মুনাফা যোগ করে পণ্যের দাম স্থির করা হয়। অর্থাৎ পণ্য বিক্রয়ের ফলে ব্যয়ের পুনরুদ্ধারের (Recovery of cost) সাথে সাথে যাতে কিছু মুনাফাও অর্জিত হয়

সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে দাম নির্ধারণের জন্য ব্যয়কে নানাভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, যেমন—মূল ব্যয়, পরিব্যয়, স্থির ব্যয়, পরিবর্তনশীল ব্যয়, বিক্রয় ও বণ্টন ব্যয়, প্রান্তিক ব্যয় (Marginal Cost) ইত্যাদি। পণ্যের সমস্ত ব্যয়গুলিকে একত্রিত করে তার উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা যোগ করলেই পণ্যের ব্যয়-ভিত্তিক মূল্য বা দাম পাওয়া যায়।

2. **চাহিদা-ভিত্তিক দাম নির্ধারণ** (Demand-based Pricing) : এই পদ্ধতিতে চাহিদা ও ব্যয় উভয়কেই ভিত্তি করে পণ্যের দাম স্থির করা হয়। অর্থাৎ পণ্যের ব্যয় পুনরুদ্ধারের পর বাজারে পণ্যের চাহিদার উপর নির্ভর করে দাম স্থির করা হয়। বাজারে পণ্যের চাহিদা যদি বেশি থাকে তাহলে পণ্যের দাম বেশি করা হয়, আর চাহিদার পরিমাণ কম থাকলে পণ্যের দামও কম করা হয়। প্রথম ক্ষেত্রে বেশি চাহিদার জন্য বেশি বিক্রয় হয়, ফলে বেশি মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয়। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মুনাফার পরিমাণ অনেক কমে যায় কারণ বিক্রয় কম হয়।

3. **বাজার-ভিত্তিক দাম নির্ধারণ** (Market-based Pricing) : বাজারে সমগোত্রীয় পণ্যের যে দাম আছে তার উপর ভিত্তি করেও পণ্যের দাম স্থির করা হয়। অবাধ প্রতিযোগিতার বাজারে এভাবেই পণ্যের দাম স্থির করা হয়। এজন্য আগে পণ্যের বাজার সমীক্ষা (market study) করা হয়। অবশ্য কোনো কোনো সময় বাজার মূল্যের কিছু কমে বা কিছু বেশিতেও পণ্যের মূল্যায়ন করা হয়। এরূপ মূল্যায়ন অবশ্য প্রান্তিক আয় (marginal income) ও প্রান্তিক ব্যয়ের (marginal cost) উপর নির্ভরশীল।

৩.১০ পণ্যের দাম নির্ধারণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ (Factors considered for Pricing of product)

পণ্যের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেগুলি নীচে আলোচনা করা হল।

1. **উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয়ের মূল্য** (Cost of Production and Cost of Sales) : পণ্যের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। পণ্যের উৎপাদন ব্যয় নিরূপণের ক্ষেত্রে মূল ব্যয় (Prime cost)-এর সাথে উৎপাদনজনিত পরিব্যয় (Factory overhead) ও প্রশাসনিক পরিব্যয় (Administrative overhead) যোগ করে উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করা হয়। এই উৎপাদন ব্যয়ের সাথে বিক্রয় ও বণ্টন সংক্রান্ত পরিব্যয় (Sales and distribution overhead) যোগ করলে বিক্রয়ের মূল্য (Cost of Sale) পাওয়া যায়। এর সাথে মূলধনের উপর একটি নির্দিষ্ট হারে লাভ (R-O-I) যোগ করে পণ্যের **বিক্রয়মূল্য** ধার্য করা হয়।

2. **প্রতিযোগী পণ্যের দাম** (Price of Competitive Goods) : কোনো পণ্যের দাম নির্ধারণের আগে বাজারে অনুরূপ পণ্যের দাম সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। কারণ বাজারে পণ্যটিকে যেসব পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে হয় তাদের দামের সাথে পণ্যটির দাম সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। পণ্যের দাম বেশি হলে ক্রেতারা বিকল্প পণ্য কিনতে উৎসাহিত হয় আবার পণ্যের দাম কম হলে ক্রেতারা পণ্যের মান সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে। সুতরাং পণ্যের দাম এই দু-য়ের মাঝামাঝি হওয়া আবশ্যক।

3. **চাহিদার পরিমাণ** (Magnitude of Demand) : পণ্যের দাম বাজারে পণ্যের চাহিদার উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে। বাজারে পণ্যের চাহিদা বেশি থাকলে বেশি দামেও পণ্য বিক্রয় সম্ভব। অন্যদিকে বাজারে চাহিদা কম থাকলে ও পণ্যের দাম বেশি রাখলে পণ্য আদৌ বিক্রয় হবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং চাহিদা কম থাকলে পণ্যের দামও কম রাখা বাঞ্ছনীয়। এজন্য পণ্যের দাম স্থির করার আগে নির্দিষ্ট বাজারে ওই পণ্য বা তার বিকল্প পণ্যের সম্ভাব্য চাহিদা, চাহিদার প্রকৃতি ও গভীরতা জানা আবশ্যক।

4. **পণ্যের গুণগত মান ও উপযোগিতা** (Quality and Utiltity of the Goods) : পণ্যের গুণগতমান ও উপযোগিতার উপরও পণ্যের দাম নির্ভর করে। পণ্যের গুণগতমান যদি ভালো হয় এবং উপযোগিতায় যদি ব্যাপক (Extensive) হয় তাহলে পণ্যের দাম বেশি হলেও কোনো সমস্যা সৃষ্টি করে না। কিন্তু এর বিপরীত অবস্থায় পণ্য বিপণনে খুবই সমস্যা দেখা দেয়। আবার অনেক পণ্যের ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয়কে পণ্যের দাম নির্ধারণের মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। পণ্যের গুণমান ও উপযোগিতার উপর নির্ভর করেই পণ্যের দাম স্থির করতে হয়।

5. **উৎপাদকের কাম্য লাভ** (Expected Profit) : উৎপাদক পণ্য উৎপাদন করে নিজের ভোগের জন্য নয়, বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের আশায়। উৎপাদিত পণ্য ক্রেতাদের চাহিদা ও প্রয়োজন মেটায় বলেই পণ্য বিক্রয় হয়। তবে এই উৎপাদন প্রক্রিয়া চালানোর জন্য উৎপাদককেই প্রয়োজনীয় মূলধন লগ্নি করতে হয়। সেজন্য উৎপাদিত পণ্যের মূল্য বা দাম নির্ধারণের সময় উৎপাদকের কাম্য লাভও বিবেচনা করতে হয়।

6. **পণ্যের প্রকৃতি** (Nature of Product) : পণ্যের দাম পণ্যের প্রকৃতির উপরও নির্ভর করে। কিছু পণ্য আছে যাদের উৎপাদন সারা বছর ধরেই চলে ও সারা বছর ধরেই বিক্রয় হয়। যেমন—কাপড়, জুতো, ঘড়ি ইত্যাদি। আবার কিছু পণ্য আছে যাদেরকে **'মরশুমী পণ্য'** (seasonal product) বলা হয়, যেমন—ছাতা, কম্বল, সোয়েটার ইত্যাদি। এসব পণ্য সারা বছর ধরে তৈরি হয়ে বিশেষ ঋতুতে (যেমন ছাতা গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে, চাদর, সোয়েটার ইত্যাদি শীতকালে) বিক্রয় হয়। অথচ এসব পণ্য উৎপাদনের জন্য মূলধন সারা বছর ধরে

আটকে থাকে এবং বিক্রয়ের ঝুঁকি বেশি থাকে। তাই এসব পণ্যের দাম একটু বেশি করা হয়। আবার কিছু পণ্যের কাঁচামাল বিশেষত কৃষিজাত পণ্যের কাঁচামাল ঋতুভিত্তিক (seasonal)। এই কাঁচামাল বছরের একটি নির্দিষ্ট ঋতুতে কিনে সারা বছরের জন্য মজুত রাখতে হয়। এর ফলে ঢের বেশি মূলধনের প্রয়োজন হয়, উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পায়, ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় এবং পণ্যের দামে এর প্রতিফলন ঘটে।

7. **বিক্রয় নীতি** (Sales Policy) : বিক্রয় নীতি বলতে বোঝায় যে পণ্য নগদে বিক্রয় হবে, না ধারে বিক্রয় হবে, নাকি নগদে ও ধারে উভয় ভাবেই বিক্রয় হবে। কারবারে সাধারণত নগদে ও ধারে পণ্য বিক্রয় হয়। ধারে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে টাকা অনেকদিন দেনাদারদের (Debtors) কাছে পড়ে থাকে এবং কিছু অর্থ অনাদায়ি থাকারও আশঙ্কা থাকে। এমতাবস্থায় পণ্যের দাম বেশি রাখা হয়। অন্যদিকে নগদ মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা হলে পণ্যের দাম কম রাখা হয়। আবার কম লাভে বেশি বিক্রয়ের মাধ্যমে বেশি লাভ করার নীতি গ্রহণ করলেও পণ্যের দাম কম রাখা হয়।

8. **বণ্টন প্রণালী** (Channel of Distribution) : পণ্যের দাম পণ্যের বণ্টন প্রণালীর প্রকৃতির উপরও নির্ভর করে। বণ্টন প্রণালীতে মধ্যস্থ কারবারির সংখ্যা যত বেশি হবে পণ্যের দাম তত বেশি হবে। আবার মধ্যস্থ কারবারিদের সংখ্যা কম হলে পণ্যের দাম কম হয়। সুতরাং বলা যায় পণ্য বণ্টন প্রণালী যত দীর্ঘ হয় পণ্যের দামও তত বেশি হয়। তাই পণ্যের দাম নির্ধারণে এই বিষয়টিকেও বিবেচনা করতে হয়।

9. **সরকারি নিয়ন্ত্রণ** (Government Control) : পণ্যের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকার অনেক সময় হস্তক্ষেপ করেন এবং দাম নিরূপণের ক্ষেত্রে কিছু নীতি ও নির্দেশ প্রকাশ করেন। যে যে পণ্যের ক্ষেত্রে এই নীতি ও নির্দেশগুলি প্রযোজ্য সেখানে এই নীতি অনুসারেই পণ্যের মূল্য স্থির করতে হয়। সরকার এভাবে পণ্যের দাম আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন। যেমন—জীবনদায়ী ঔষধ, পেট্রল-ডিজেল, বাসভাড়া, রেলভাড়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে এই নীতির ব্যবহার দেখা যায়। সুতরাং কিছু কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত দামের (administered price) বিষয়টিও বিশেষ গুরুত্ব পায়।

10. **ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতা ও সন্তুষ্টি** (Purchasing Power and Satisfaction of Customer) : পরিশেষে বলা যায় যে উপরোক্ত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব প্রদান করা সত্ত্বেও বিপণনকারীকে দেখতে হবে পণ্যের দাম যেন ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে এবং দাম এমন হবে না যাতে ক্রেতা অসন্তুষ্ট হয়। কারণ আধুনিক বিপণন ক্রেতা-কেন্দ্রিক, ক্রেতা সন্তুষ্টির মাধ্যমে মুনাফা অর্জন হল বর্তমান বিপণন দর্শন। সেজন্য যে বাজারে পণ্য বিপণন করা হবে সেই বাজারে ক্রেতাদের ক্রয়ক্ষমতা আগাম যাচাই করে নিতে হবে। এর সাথে পণ্য সম্পর্কিত

ক্রেতার ধারণাজনিত দাম (perceived price) জানার চেষ্টা করতে হবে এবং দাম নির্ধারণের সময় দেখতে হবে যে পণ্যের দাম যেন কোনোভাবেই ক্রেতার ধারণাজনিত দামের থেকে বেশি না হয়। ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতা ও সন্তুষ্টির বিষয়টি বিবেচনা না করে পণ্যের দাম নির্ধারণ করা হলে পণ্য বিপণনে সাফল্য পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৩.১১ পণ্য-মূল্য বা দাম নির্ধারণের নীতিসমূহ (Pricing Policies of a Product)

পণ্যের দাম নির্ধারণের উপর বিপণনের ভবিষ্যৎ তথা সমগ্র প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। সেজন্য পণ্যের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। কোনো পণ্যের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে কতকগুলি নীতি মেনে চলা হয়। এই নীতিগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

1. **অন্তর্ভেদী দাম-নির্ধারণ নীতি** (Penetrating Pricing Policy) : সাধারণত কতকগুলি নতুন পণ্যের বিপণনে এই নীতি গ্রহণ করা হয়। যেহেতু পণ্যটি নতুন এবং ক্রেতাদের সাথে এখনও পণ্যের পরিচিতি ঘটেনি, সেহেতু পণ্যের দাম এরূপ করা হয় যাতে বাজারে প্রথম অনুপ্রবেশজনিত বাধা কাটিয়ে উঠতে পারে এবং বাজারে নিজের জায়গা করে নিতে পারে। এই নীতিতে পণ্যের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম রাখা হয়। এর ফলে বাজারে নতুন পণ্য বিক্রয়ের সুযোগ ঘটে, ক্রেতার আনুগত্য পাওয়া যায় ও প্রতিযোগিতা মোকাবিলা করা যায়।

2. **'মাখন তোলা' দাম-নির্ধারণ নীতি** (Skimming Pricing Policy) : এরূপ মূল্য-নীতি সাধারণত একচেটিয়া কারবারের পণ্যের (product of monopoly business) ক্ষেত্রেই দেখা যায়। দুধের সারবস্তু হল মাখন। দুধ মন্থন করে যেমন মাখন পাওয়া যায় তেমনি এরূপ ক্ষেত্রে পণ্যের দাম এত বেশি করা হয় যাতে উৎপাদকের বিনিয়োগ খুব দ্রুত উঠে আসে। সাধারণত উচ্চ ক্রয় ক্ষমতাসম্পন্ন ক্রেতাদের দিকে লক্ষ্য রেখেই এরূপ পণ্যের দাম নির্ধারণ করা হয় যাতে ক্রেতারা দাম সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ না করে। এসব পণ্যের কোনো বিকল্প থাকে না, ফলে প্রতিযোগিতাও থাকে না। নতুন প্রযুক্তির জন্য নতুন ঔষধ, পাঠ্যপুস্তক ও উচ্চবিত্তদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদির ক্ষেত্রে এরূপ মূল্য-নীতির ব্যবহার খুব বেশি দেখা যায়।

3. **বাজার-দাম নির্ধারণ নীতি** (Market Pricing Policy) : দেশে যখন অবাধ অর্থনীতি চালু থাকে তখন পণ্যের বাজারেও অবাধ প্রতিযোগিতা দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় যদি পণ্যের একটি **প্রথাগত মূল্যস্তর** বিরাজ করে তাহলে পণ্যের মূল্য বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে না। পণ্যের প্রকৃত মূল্য যাই হোক না কেন পণ্যটি বাজার মূল্যেই বিক্রয় হয়। সাধারণত বহুল ব্যবহৃত একই ধরনের ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে এরূপ বাজার মূল্য দেখা যায় অর্থাৎ যেখানে একটি পণ্যের একাধিক সমমানের বিকল্প পণ্য থাকে।

4. **বাজার-অধিক দাম নির্ধারণ নীতি** (Market-plus Pricing Policy) : সাধারণত অবাধ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কতকগুলি বিশেষ পণ্যের ক্ষেত্রে বাজার-অধিক মূল্যে পণ্যটির মূল্য নির্ধারণ করা হয়। অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রে পণ্যটির আলাদা বিশেষত্ব থাকা প্রয়োজন। পণ্যটি বহুল প্রচলিত হলে এবং পণ্যের মান উৎকৃষ্ট ও মর্যাদাপূর্ণ হলে ক্রেতা পণ্যের বাজার দামের চেয়ে বেশি দাম দিতে রাজি হয় এবং বাজার-অধিক মূল্যে পণ্যটির দাম নির্ধারণ করা যায়।

5. **বাজার-নিম্ন দাম নিরূপণ নীতি** (Market-minus Pricing Principles) : যেসব পণ্যের বণ্টন প্রণালী (channels of distribution) ছোটো, তারা এই মূল্যে পণ্যের দাম নির্ধারণ করে। সাধারণত উৎপাদকরা যখন নিজস্ব বিপণি মারফৎ পণ্য বিক্রয় করে তখন তারা বাজার দাম অপেক্ষা কম দামে পণ্য বিক্রয় করতে পারে। আবার পণ্যের মান খারাপ হলে বা বিপণন-সংক্রান্ত খরচ কম হলে বাজার মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা হয়। সেক্ষেত্রে পণ্যের মোট ব্যয় কম থাকে।

6. **পণ্য শ্রেণির দাম নির্ধারণ নীতি** (Full Line Pricing Policy) : কিছু উৎপাদক আছে যারা একাধিক পণ্য উৎপাদন করে থাকে। এই পণ্যগুলি একে অপরের পরিপূরক না হলেও তাদের মধ্যে একটি আন্তঃসম্পর্ক থাকে এবং বিক্রয় বৃদ্ধিতে পরস্পরকে সহযোগিতা করে। এরূপ ক্ষেত্রে বিপণনকারী পণ্যগুলির দাম এমনভাবে নির্ধারণ করে যাতে কোনো পণ্যের দাম কম থাকে আবার কোনো পণ্যের দাম বেশি থাকে। এই নীতিতে দাম নির্ধারণের ফলে সামগ্রিকভাবে উৎপাদকের মোট বিক্রয় ও মোট লাভ কিন্তু একই থাকে।

7. **সঠিক বা ন্যায়সঙ্গত দাম নির্ধারণ নীতি** (Right or Fair Pricing Policy) : এই নীতিতে পণ্যের দাম নির্ধারণের সময় উৎপাদকের দিকে যেমন লক্ষ রাখা হয় তেমনি সমাজের দিকেও লক্ষ রাখা হয়। অর্থাৎ উৎপাদক যাতে তাঁর বিনিয়োগকৃত মূলধন ও ঝুঁকির জন্য কিছু মুনাফা পান সেদিকে যেমন দৃষ্টি দেওয়া হয় তেমনি জনগণের স্বার্থও যাতে রক্ষিত হয় অর্থাৎ ক্রেতাদের যাতে পণ্যের জন্য বেশি মূল্য দিতে না হয় সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়।

8. **ব্যয়-নিম্ন দাম নির্ধারণ নীতি** (Cost-minus Pricing Policy) : কখনো কখনো উৎপাদক তার ক্ষতির পরিমাণ কমানোর উদ্দেশ্যে পণ্যের মোট উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা কম মূল্যে পণ্য বিক্রয় করে। সাধারণত অস্বাভাবিক অবস্থায় ও মন্দার সময় মূলধন-নিবিড় (capital intensive) উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসৃত হয়।

9. **ব্যয়-অধিক দাম নির্ধারণ নীতি** (Cost-plus Pricing Policy) : বাজারে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই নীতিতেই পণ্যের দাম নির্ধারণ করা হয়। পণ্যের বিক্রয়মূল্য ও পণ্যের মোট ব্যয়ের পার্থক্যকেই 'মূল্য বাড়ানো' বলে। যেমন উৎপাদক তার উৎপাদন মূল্যের উপর কিছু লাভ রেখে পণ্যটি পাইকারদের বিক্রয় করে। পাইকাররা আবার তাদের ক্রয়মূল্যের উপর কিছু

লাভ রেখে খুচরা কারবারিদের বিক্রয় করে। খুচরা কারবারিরা আবার তাদের ক্রয়মূল্যের উপর কিছু লাভ রেখে পণ্যটি ভোক্তার কাছে বিক্রয় করে। এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিক্রয়মূল্য বাড়ানোর মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় করা হয়।

10. **বিনিয়োগের উপর আয়-ভিত্তিক দাম নির্ধারণ নীতি** (R-O-I Pricing Policy) : কারবার করার প্রাথমিক শর্ত হল মূলধনের বিনিয়োগ। কারবারে যে পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ লগ্নি করা হয় তাকেই বলে বিনিয়োজিত মূলধন। মালিক এই মূলধন বিনিয়োগ করে আয়ের উদ্দেশ্যে। এই নীতির উদ্দেশ্য হল বিনিয়োগের উপর আয় সুনিশ্চিত করা। পণ্যের মূল্য এমনভাবে ঠিক করা হয় যাতে বিনিয়োগকৃত মূলধনের উপর সম্ভাব্য আয় পেতে মালিকের কোনো অসুবিধা না হয়।

৩.১২ সারাংশ

পণ্য বলতে বোঝায় এমন এক বস্তু যার মধ্যে একগুচ্ছ উপযোগিতা বর্তমান থাকে এবং যার সেবা প্রদানের ক্ষমতা থাকে। পণ্য বা সেবার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি ঘটে ও ক্রেতার তৃপ্তি সাধন হয়। পণ্য যেমন প্রতিষ্ঠানকে সচল রাখে, তেমনি পণ্যের সামাজিক গুরুত্বও রয়েছে। যেহেতু পৃথিবীতে কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয় এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, পণ্যের চাহিদা মেটানোর ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটে চলেছে, ফলে একই পণ্যের উপর নির্ভরতা ক্রেতাদের কমছে। সেই অর্থে বলা যেতে পারে পণ্যের একটি আয়ুষ্কাল থাকে এবং যার কতগুলি স্তর আছে, যেমন—উপস্থাপন স্তর, উন্নয়ন স্তর, পরিণত স্তর, সম্পৃক্ত স্তর ও ক্ষয়িষ্ণু স্তর। আবার পণ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয় রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পণ্যের দাম। এই পণ্যের দাম নির্ধারণ একটি জটিল প্রক্রিয়া। বিপণন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যপূরণে দাম নির্ধারণের যে ভূমিকা দেখা যায় তা বিপণন মিশ্রণের অন্য কোনো উপাদানের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। পণ্যের দাম এমন হওয়া উচিত যা ক্রেতাদের প্রলুব্ধ করবে পণ্য ক্রয় করার জন্য এবং যার প্রতিফলন প্রতিষ্ঠানের মুনাফার উপর পড়বে এবং প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করবে। উপরোক্ত বিষয়গুলি এই এককে আলোকপাত করা হয়েছে।

৩.১৩ অনুশীলনী

ক) বহুপছন্দ ভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। যে কোনো পণ্যের তিনটি মাত্রা থাকে। নীচের কোন্‌টি এই তিন মাত্রার অন্তর্ভূক্ত নয়?

ক) এটি বস্তুগত পণ্য
খ) এটি কার্যকরী পণ্য
গ) এটি বর্দ্ধিত পণ্য
ঘ) এটি সাধারণ গুণসম্পন্ন পণ্য

২। পণ্যের জীবনচক্রের কোন্ স্তরে 'প্রতিস্থাপন বিক্রয়' ঘটতে থাকে?

ক) উপস্থাপন স্তরে
খ) পরিণত স্তরে
গ) সম্পৃক্ত স্তরে
ঘ) কোনো স্তরেই নয়

৩। নীচে কোন্ বিষয়ের ওপর পণ্যের দাম নির্ভর করে না?

ক) বাজারের অবস্থা
খ) চাহিদার পরিমাণ
গ) ক্রেতার মানসিক ইচ্ছা
ঘ) জোগানের পরিমাণ

৪। যে পদ্ধতিতে মোট উৎপাদন ব্যয়ের উপর প্রয়োজনীয় মুনাফা যোগ করে পণ্যের দাম নির্ধারিত হয় তাকে বলে _________।

ক) বাজার ভিত্তিক দাম নির্ধারণ
খ) চাহিদা ভিত্তিক দাম নির্ধারণ
গ) জোগান ভিত্তিক দাম নির্ধারণ
ঘ) ব্যয় ভিত্তিক দাম নির্ধারণ

৫। যে সব পণ্যের বণ্টন প্রণালী ছোটো তারা যে নীতি অনুসরণ করে পণ্যের দাম নির্ধারণ করে তাকে বলে __________।

ক) বাজার-নিম্ন দাম নিরূপণ নীতি
খ) অন্তর্ভেদী দাম নির্ধারণ নীতি
গ) 'মাখন তোলা' দাম নির্ধারণ নীতি
ঘ) বাজার-অধিক দাম নির্ধারণ নীতি

খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

১। পণ্য সম্পর্কে ধারণা দিন।

২। পণ্যের দুটি গুরুত্ব উল্লেখ করুন।

৩। পণ্য পরিকল্পনা কাকে বলে?

৪। পণ্যের জীবনচক্র বলতে কী বোঝায়?

৫। পণ্যের জীবনচক্রের সম্পৃক্ত স্তর কী?

৬। পণ্যের ব্যয়-ভিত্তিক দাম নির্ধারণ কাকে বলে?

৭। বাজার-ভিত্তিক দাম নির্ধারণ বলতে কী বোঝেন?

৮। অন্তর্ভেদী দাম-নির্ধারণ নীতি কী?

৯। 'মাখন তোলা' দাম নির্ধারণ নীতি কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়?

১০। বাজার-অধিক দাম নির্ধারণ নীতি বলতে কী বোঝেন?

গ) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

১। পণ্যের সংজ্ঞা দিন। পণ্যের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

২। পণ্য পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যে সব বিষয় গুরুত্ব পায় সে সম্পর্কে ধারণা দিন।

৩। পণ্যের আয়ুষ্কাল চক্র সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। পণ্যের মূল্য নির্ধারণের ভিত্তিসমূহ কী কী?

৫। পণ্যের দাম নির্ধারণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা করুন।

৬। পণ্যের মূল্য নির্ধারণের নীতিসমূহ আলোচনা করুন।

একক ৪ ❑ বিপণন প্রসার (Marketing Promotion)

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৩ বিপণন প্রসার—অর্থ

৪.৪ বিপণন প্রসারের গুরুত্ব

৪.৫ প্রসার কৌশলের বিবেচ্য বিষয়মসূহ

৪.৬ বিজ্ঞাপন—সংজ্ঞা

৪.৭ বিজ্ঞাপনের তাৎপর্য ও কাজ

৪.৮ বিক্রয় প্রসার—অর্থ ও সংজ্ঞা

৪.৯ বিক্রয় প্রসারের কৌশলসমূহ

৪.১০ সারাংশ

৪.১১ অনুশীলনী

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি থেকে নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

- বিপণন প্রসারের অর্থ
- বিপণন প্রসারের গুরুত্ব
- বিপণন প্রসার কৌশলের বিবেচ্য বিষয়সমূহ
- বিজ্ঞাপনের সংজ্ঞা
- বিজ্ঞাপনের তাৎপর্য ও কার্যাবলী
- বিক্রয় প্রসারের অর্থ ও সংজ্ঞা
- বিক্রয় প্রসারের কৌশলসমূহ

৪.২ প্রস্তাবনা

উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যের প্রবাহ ও একটি কার্যকরী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় সম্ভব হয়। একটি সফল বিপণন ব্যবস্থার মধ্যে যে গুণগুলি বর্তমান থাকে তা হল—সঠিক প্রসারের মাধ্যমে সঠিক পণ্য, সঠিক দামে, সঠিক জায়গায় ও সঠিক সময়ে ক্রেতাদেরকে সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি। উন্নত মানের পণ্য বা সেবা প্রস্তুত করলেই যে তা বিক্রি হবে এমন কথা বলা যায় না। পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হয়। বিপণন প্রসার এই কাজটিই করার দায়িত্ব নেয়। বিজ্ঞাপন হল বিপণন প্রসারের অন্যতম মাধ্যম যার মাধ্যমে তথ্য জ্ঞাপন সম্ভব হয় এবং সম্ভাব্য ক্রেতা পণ্য বা পরিষেবা ক্রয় করতে আগ্রহী হয়। সুতরাং বিজ্ঞাপন হল বস্তুটির বাতায়ন সজ্জা। উপরের বিষয়গুলি ছাড়াও এই এককে বিক্রয় প্রসার সম্পর্কেও ধারণা দেওয়া হয়েছে যার সাহায্যে সম্ভাব্য ক্রেতাদের প্রয়োজন, চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ সম্ভব হয়।

৪.৩ বিপণন প্রসার বা সম্প্রসারণ—অর্থ (Marketing Promotion—meaning)

বিপণন মিশ্রণের চারটি উপাদানের মধ্যে পণ্য মিশ্রণ ও দাম মিশ্রণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলে বিপণন বিভাগ পণ্য প্রসারের জন্য মনোনিবেশ করে। প্রসার বলতে মূলত যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে বোঝায়। অর্থাৎ উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে একটি কার্যকরী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য। বর্তমানে পণ্য খুব বেশি প্রযুক্তি নির্ভর ও আধুনিক হওয়ায় এবং বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হওয়ার ফলে পণ্য বিপণন ক্রমশই জটিল হয়ে পড়ছে। উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যের প্রবাহ ও একটি কার্যকরী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে না পারলে বর্তমানে পণ্য বিপণনে সাফল্য পাওয়া সম্ভব হয় না। সেজন্য প্রসার মিশ্রণকে '**যোগাযোগ মিশ্রণ**'ও বলা হয়। পণ্য সংক্রান্ত তথ্যের এই আদান-প্রদান ও যোগাযোগ ব্যবস্থা পণ্যটি বাজারে প্রবেশ করার পর পণ্যের মাধ্যমে গড়ে তোলা যায়, আবার বাজারে পণ্যটি উপস্থাপন করার আগেও গড়ে তোলা যায়। কারণ কোনো উৎপাদক যখন কোনো নতুন পণ্য উৎপাদন করে বা পুরানো পণ্যকে পরিবর্তন করে অথবা চালু কোনো পণ্যের বিক্রয়-বৃদ্ধি ঘটাতে সচেষ্ট হয়, তখন তাকে অবশ্যই তার পণ্যবার্তা সম্ভাব্য ক্রেতাদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। আর এর থেকেই প্রসার মিশ্রণের উদ্ভব ঘটে।

একথা সত্য যে উৎপাদক পণ্য উৎপাদন করে ক্রেতাদের প্রয়োজন, চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা মেটানোর জন্য। কিন্তু পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে এটিই যথেষ্ট নয়। পণ্যের প্রকৃতি যেমনই হোক না কেন, পণ্য উৎপাদনের সাথে সাথে উৎপাদকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। বর্তমান যুগের বিপণন ক্রেতা-কেন্দ্রিক। সুতরাং উৎপাদকের প্রাথমিক কর্তব্য হল ক্রেতাদের প্রয়োজন জানা এবং প্রয়োজন মেটানোর জন্য

কোথায়, কখন, কীভাবে এবং কী দামে ক্রেতারা পণ্যটি পাবে তা জানানো। একটি সফল বিপণন ব্যবস্থার মধ্যে যে গুণগুলি বর্তমান থাকে তা হল—**'সঠিক প্রসারের মাধ্যমে সঠিক পণ্য, সঠিক দামে, সঠিক জায়গায় ও সঠিক সময়ে ক্রেতাদেরকে সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি।'** সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে পণ্য বিক্রয় সহজ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কার্যকলাপ গড়ে উঠেছে। এই কার্যকলাপগুলিকে এককথায় **'প্রসারমূলক কার্যকলাপ'** বলা হয় এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একে বলা হয় **প্রসার মিশ্রণ**।

আধুনিক বিপণন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রসার মিশ্রণের উপাদান বা হাতিয়ার মূলত চার ধরনের—বিজ্ঞাপন, ব্যক্তিগত বিক্রয়, বিক্রয় প্রসার এবং প্রচার ও জনসম্পর্ক। নীচে এদের সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া হল।

1. **বিজ্ঞাপন** (Advertising) : ক্রেতাদের কাছে পণ্য-বার্তা জ্ঞাপনের সর্বোত্তম মাধ্যম হল বিজ্ঞাপন। এটি এক ধরনের অব্যাক্তিক উপস্থাপনা এবং প্রসার প্রচেষ্টা যা পণ্য বা সেবাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে এবং এর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়।
2. **বিক্রয় সম্প্রসারণ বা বিক্রয় প্রসার** (Sales promotion) : এটি হল পণ্য বা সেবা ক্রয় করার জন্য ক্রেতাদেরকে স্বল্প-মেয়াদি উৎসাহ প্রদান।
3. **ব্যক্তিগত বিক্রয়** (Personal selling) : প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিক্রয়কর্মীদের মাধ্যমে সম্ভাব্য ক্রেতাদের সাথে মিলিত হয়ে পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা।
4. **জনসম্পর্ক ও প্রচার** (Public relations and publicity) : কোম্পানি এবং পণ্যের ভাবমূর্তি উন্নত করতে যে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

এর সাথে অবশ্য অনেকে আর একটি উপাদানের উল্লেখ করেন। প্রসার মিশ্রণের এই পঞ্চম উপাদানটি হল **সরাসরি বিপণন** (Direct Marketing)। এই ব্যবস্থায় ক্রেতাদের সাথে ডাক বা টেলিফোন বর্তমানে ইন্টারনেট, ই-মেল, ফ্যাক্স ইত্যাদি মারফত যোগাযোগ স্থাপন করা হয় ও তাদের ফরমাশ সরাসরি সরবরাহ করা হয়। তবে এই উপাদানগুলি পরস্পরের পরিপূরক। বিক্রয় প্রসারের উদ্দেশ্যে একই সাথে একাধিক উপাদানের প্রয়োগ দেখা যায়। অবশ্য বর্তমানে সরাসরি বিপণন বা অন্‌লাইন বিপণন ক্রমশঃই জনপ্রিয় হচ্ছে। এর ফলে গতানুগতিক প্রসার মিশ্রণের মধ্যে সাম্প্রতিককালে কিছু পরিবর্তন ঘটতে দেখা যাচ্ছে।

৪.৪ বিপণন প্রসারের গুরুত্ব (Importance of Marketing Promotion)

বিপণন মিশ্রণের তৃতীয় 'P'টি হল 'Promotion' অর্থাৎ বিপণন প্রসার বা সম্প্রসারণ। বর্তমানে তীব্র প্রতিযোগিতার বাজারে পণ্য নিজে থেকে বিক্রয় হয় না। পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হয়। বিপণন প্রসার এই কাজটিই করার দায়িত্ব নেয়। একটি ভালো, উন্নতমানের পণ্য উৎপাদন করলেই বা

তার দাম কম করলেও বা বণ্টনের ব্যবস্থা করলেও পণ্য বিপণনে সাফল্য পাওয়া সম্ভব হয় না যদি না পণ্য বার্তা সম্ভাব্য ক্রেতা বা ভোক্তার কাছে তুলে ধরা হয়। বস্তুত বিপণনকারীর পণ্যের সাথে ক্রেতাদের সংযোগ ঘটানোর প্রক্রিয়াই হল বিপণন প্রসার। বিপণন প্রসারের গুরুত্ব নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরা যায়—

(i) **পণ্যের দৃশ্যমানতা বাড়ায় ও পরিচিতি ঘটায়** (Increases visibility of product) **:** পণ্য বা সেবা উৎপাদন করা হয় বিক্রয়ের জন্য। পণ্য বিক্রয় না হলে বিপণন নিরর্থক হয়ে পড়ে। পণ্য বিক্রয়ের পূর্বশর্তই হল পণ্যটি সম্বন্ধে সম্ভাব্য ক্রেতাদের অবহিত করা। পণ্য সম্বন্ধে তারা কিছু না জানলে বা পণ্য সম্বন্ধে কোনো ধারণা গড়ে না উঠলে পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি হয় না। বিপণন প্রসারের মাধ্যমে বাজারে পণ্যের দৃশ্যমানতা ও পরিচিতি গড়ে তোলা হয়। এর ফলে পণ্যের বাজার সৃষ্টি হয় ও পণ্য বিক্রয়ের পথ সুগম হয়। তাই বিপণনকে সফল করার জন্য এর গুরুত্ব অপরিসীম।

(ii) **ব্র্যান্ড পরিচিতি গড়ে তোলে** (Builds brand value) **:** পণ্য বা সেবা বাজারে পরিচিত হলে তার ব্র্যান্ড গড়ে ওঠে। ব্র্যান্ড বলতে বোঝায় পণ্যটি যে নামে বাজারে পরিচিত হয়। বাজারে ব্র্যান্ড পরিচিতি গড়ে উঠলে ক্রেতারা বিনা দ্বিধায় পণ্য ক্রয় করে। ফলে পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধি ঘটে। তাই পণ্যের ব্র্যান্ড পরিচিতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও বিপণন প্রসার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর এই পরিচিতি গড়ে উঠলে পণ্য বিপণনও সফল হয়। প্রচার ও জনসম্পর্ক পণ্যের ব্র্যান্ড পরিচিতি ঘটাতে ও ধরে রাখতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

(iii) **আয় বৃদ্ধি ঘটায়** (Improves revenue) **:** পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধিতে বিপণন প্রসার বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পণ্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচার পণ্য সংক্রান্ত তথ্য জনসাধারণের কাছে তুলে ধরে। ব্যক্তিগত বিক্রয় ক্রেতাকে প্রকৃত ক্রেতায় পরিণত করে। এর ফলে বিক্রয় বৃদ্ধি ঘটে ও প্রতিষ্ঠানের আয় বৃদ্ধি পায়। প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও বিপণন ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে ও কারবারে সাফল্য আসে।

(iv) **প্রতিযোগিতার মোকাবিলা** (To compete) **:** বর্তমান বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে বিপণনকারীকে পণ্য বিক্রয় করতে হয়। কারণ প্রত্যেক উৎপাদক তাদের নিজ নিজ পণ্য নিয়ে বাজারে উপস্থিত হয় ও পণ্য বিক্রয়ের চেষ্টা করে। সেকারণেই বিক্রয় বর্তমানে বিপণনের সংকটপূর্ণ ক্ষেত্র। এমতাবস্থায় প্রত্যেক বিপণনকারীই বিপণন প্রসারের সহায়তা নিয়ে তাদের পণ্য বিক্রয় সর্বাধিক করার চেষ্টা করে। এজন্য প্রয়োজনে তারা পণ্যের মধ্যে ক্রেতার পছন্দসই বৈশিষ্ট্য যোগ করে এবং ক্রেতাদের আরও বেশি পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করে। বিপণন প্রসার কর্মসূচি বিপণনকারীর পণ্যকে অন্যান্যদের থেকে আলাদা ও অধিক গুণসম্পন্ন হিসাবে ক্রেতাদের কাছে তুলে ধরে। এর সাহায্যে বিপণনকারী বাজারের প্রতিযোগিতা মোকাবিলা করার মতো শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়।

(v) **জনসাধারণকে শিক্ষিত করে** (To educate people) : বিপণন প্রসার কর্মসূচি ক্রেতাদের সাথে সাথে জনসাধারণকেও পণ্য সম্পর্কিত বার্তা জ্ঞাপন করে ও পণ্যের প্রকৃতি, গুণমান, দাম, ব্যবহার বিধি, পণ্য ব্যবহারে সাবধানতা ইত্যাদি বিষয় অবগত করে। পণ্য ব্যবহারের সুবিধা, অসুবিধা, ক্রয় পরবর্তী পরিষেবা, গ্যারান্টি ও ওয়ার‍্যান্টি ইত্যাদি জানার মাধ্যমে জনসাধারণ পণ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকে।

(vi) **ক্রেতা সচেতনতা গড়ে তোলা** (To spread awareness) : বাজারে পণ্যের বিকল্প পণ্যও থাকে যারা সমগোত্রীয় এবং যাদের থেকে প্রায় একই ধরনের সুবিধা পাওয়া সম্ভব। ক্রেতা বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে তুলনা করে যে পণ্যটি সর্বোত্তম বলে মনে করে সেই পণ্যটিই ক্রয় করে ও নিজের প্রয়োজন পূরণ করে। পণ্য ক্রয়ের আগে পণ্য সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য যেমন ওজন, দাম, ব্যবহারবিধি, কতদিনের মধ্যে ব্যবহার করতে হবে, ওয়ার‍্যান্টি থাকলে তার সময়সীমা ইত্যাদি জানতে পারে। বিক্রয় প্রসার কর্মসূচির মাধ্যমে ক্রেতাদের জানানোর ব্যবস্থা করা হয় আর এর ফলে ক্রেতারা আরও সচেতন হয়ে ওঠে। জনসাধারণের মধ্যে ক্রেতা সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে সামগ্রিকভাবে পণ্যের বাজার ভালো হয় এবং ভালো গুণমানের পণ্য বিপণনে বিশেষ সমস্যা হয় না।

(vii) **কর্মসংস্থান সৃষ্টি** (Employment generation) : বিপণন প্রসার তিনটি উপাদান নিয়ে গড়ে ওঠে। এগুলি হল বিজ্ঞাপন, ব্যক্তিগত বিক্রয় এবং প্রচার ও জনসম্পর্ক। বিজ্ঞাপন একটি আলাদা শিল্প বলে গণ্য হয় এবং এই শিল্পে প্রচুর মানুষ এবং কলাকুশলী যুক্ত থাকে। আর ব্যক্তিগত বিক্রয় কর্মসূচিতে যুক্ত থাকে বিক্রয়কর্মীরা। সারাবিশ্বে বিক্রয়কাজে যুক্ত কর্মীদের সংখ্যাই সর্বাধিক যারা বিক্রয়কর্মী হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করে। প্রচার ও জনসম্পর্কও বহু মানুষের জীবিকা নির্বাহ করতে সাহায্য করে। সুতরাং বিপণন কর্মসূচি বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং সেকারণে এর জাতীয় গুরুত্ব রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে বিপণন প্রসার বিপণনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে এই গুরুত্ব সাধারণত যেসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেগুলি হল : বাজারে প্রতিযোগিতার অবস্থা, পণ্যের পর্যাপ্ততা, পণ্যের পৃথকীকরণ ও পণ্য জীবনচক্রের স্তর।

৪.৫ প্রসার কৌশলের বিবেচ্য বিষয়সমূহ (Factors in determining promotion strategies)

যে পরিকল্পিত পথ অনুসরণ করে বিপণনে প্রতিযোগীদের থেকে ভালো ফল করা সম্ভব হয় তাকেই কৌশল বলে। পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে প্রসার কৌশল হল সেই পরিকল্পনা যা অনুসরণ করে

পণ্য বিক্রয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। প্রসার কৌশলের বিবেচ্য বিষয় হল চারটি : **পণ্য** বা **সেবা**, **ক্রেতা**, **প্রতিষ্ঠান** ও **বণ্টন প্রণালী**।

1. **পণ্য বা সেবা** (Product or Service) : পণ্য বা সেবাই হল বিক্রয়ের কেন্দ্রবিন্দু। পণ্যের প্রকৃতির উপর সম্প্রসারণ কৌশল অনেকাংশে নির্ভর করে। পণ্য প্রসার কৌশল হিসাবে বিজ্ঞাপনের ব্যবহার সর্বাধিক। তবে পণ্যটি যদি নিত্য ব্যবহার্য ভোগ্যপণ্য হয় তাহলে বিজ্ঞাপনের যে মাধ্যম ব্যবহৃত হয়, পণ্যটি মূলধনী পণ্য হলে বিজ্ঞাপনের মাধ্যম অন্য হয়। সাধারণত ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে 'গণমাধ্যম' অর্থাৎ রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়, কিন্তু মূলধনী পণ্যের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় পত্র-পত্রিকায়।
2. **ক্রেতা** (Customer) : ক্রেতাই হল বিপণনের শেষ লক্ষ্যস্থল। ক্রেতার কাছে পণ্য হস্তান্তরের সাথে সাথে বিক্রয় কাজ পরিসমাপ্তি লাভ করে। ক্রেতার চাহিদা মেটানোর জন্য ও তৃপ্তিসাধনের জন্যই কারবারি পণ্য উৎপাদন করে। সুতরাং প্রসার কৌশলে ক্রেতার পছন্দ-অপছন্দ, রুচি, ক্রয়ক্ষমতা, অবস্থান, আকাঙ্ক্ষা, সমস্যা ইত্যাদি যথাযথভাবে বিবেচনা করতে হয়। কারণ এগুলির উপর বিপণন প্রসারের সাফল্য নির্ভর করে। যে কৌশলে ক্রেতার সর্বাধিক তৃপ্তিসাধন সম্ভব, পণ্য প্রসারে সেই কৌশলই গ্রহণ করা হয়।
3. **প্রতিষ্ঠান** (The Firm) : বর্তমানে প্রতিটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানই তার পণ্য বিপণনে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। এই প্রতিযোগিতার মাত্রা আবার বাজারে প্রতিষ্ঠানের সুনামের উপর নির্ভর করে। প্রসার কৌশলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও ভাবমূর্তি গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। সুতরাং প্রসার কৌশল এরূপ হওয়া উচিত যাতে প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও ভাবমূর্তি কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।
4. **বণ্টন প্রণালী** (Distribution Channel) : পণ্যের বণ্টন প্রণালীও পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণত পণ্যের প্রকৃতির উপর পণ্যের বণ্টন প্রণালী নির্ভর করে। যেমন, পচনশীল পণ্যের ক্ষেত্রে বণ্টন প্রণালীর দৈর্ঘ্য ছোটো হয়। অন্যান্য দ্রব্যের ক্ষেত্রেও পণ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী বণ্টন প্রণালী ঠিক করা হয়।

৪.৬ বিজ্ঞাপন—সংজ্ঞা (Advertisement—Definition)

বর্তমান যুগ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞাপনের। বিজ্ঞান নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবন করে, প্রযুক্তি পণ্য সৃষ্টির পথ সুগম করে, আর বিজ্ঞাপন পণ্য বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। বর্তমানে উন্নত যন্ত্রসভ্যতার যুগে ও জটিল জীবনযাত্রার মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কারবারের সাফল্য অনেকাংশেই নির্ভর করে বিজ্ঞাপনের উপর। কারণ পণ্য বিপণনে সাফল্য না পেলে প্রতিষ্ঠান তার অস্তিত্ব বজায়

রাখতে পারে না। বিজ্ঞাপন ক্রেতাদের কাছে পণ্য-বার্তা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে। বর্তমানে কোনো নতুন পণ্য বাজারে উপস্থাপন করতে বা চালু পণ্যের বাজার ধরে রাখতে বা বাজার সম্প্রসারিত করতে হলে বিজ্ঞাপনের সহায়তা অবশ্যই নিতে হয়।

সাধারণভাবে '**বিজ্ঞাপন হল তথ্য জ্ঞাপনের বিশেষ মাধ্যম**'। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পণ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সম্ভাব্য ক্রেতাদের কাছে পাঠানো হয়। এর উদ্দেশ্য হল তথ্য জ্ঞাপনের মাধ্যমে সম্ভাব্য ক্রেতাকে প্রকৃত ক্রেতায় পরিণত করা। এটি প্রসার মিশ্রণের সবচেয়ে শক্তিশালী উপাদান। ইংরাজী Advertisement শব্দটির উদ্ভব হয়েছে ল্যাটিন শব্দ 'advertise' থেকে যার অর্থ হল 'ফেরাতে' বা 'ঘোরাতে' (To turn to)। বিজ্ঞাপনের আভিধানিক অর্থ হল 'জনগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া বা জনসমক্ষে ঘোষণা করা'। ব্যুৎপত্তিগতভাবে বিজ্ঞাপন হল 'বিশেষভাবে জ্ঞাপন'।

The American Marketing Association বিজ্ঞাপনের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল : 'প্রবর্তকের দ্বারা পণ্য, সেবা বা ধারণার ব্যয়যুক্ত নৈর্ব্যক্তিক উপস্থাপনা ও প্রচার'।

বিজ্ঞাপনের অপর একটি সংজ্ঞা হল—'প্রবর্তক কর্তৃক পণ্য, সেবা বা ধারণার ব্যয়যুক্ত নৈর্ব্যক্তিক গণসংযোগ'।

সিনক্লেয়ার লুইস বিজ্ঞাপনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন 'বিজ্ঞাপন হল একটি মূল্যবান অর্থনৈতিক উপাদান, কারণ পণ্য বিক্রয়ের এটিই সবচেয়ে সস্তা উপায়, বিশেষত পণ্যগুলি যদি মূল্যহীন হয়' ('Advertisement is a valuable economic factor because it is the cheapest way of selling goods, particularly if the goods are worthless.')।

জন হবসন সংক্ষিপ্তভাবে বলেছেন 'বিজ্ঞাপন হল সন্তুষ্টির বাতায়ন সজ্জা' ('Advertisement is the window display of satisfaction')।

উপরের সংজ্ঞাগুলি থেকে বিজ্ঞাপনের যেসব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় সেগুলি হল :

প্রথমত বিজ্ঞাপন একটি বাণিজ্যিক লেনদেন, কারণ এর সাথে অর্থ-ব্যয় জড়িত আছে। প্রচারের সাথে বিজ্ঞাপনের মৌলিক পার্থক্যও এখানেই।

দ্বিতীয়ত বিজ্ঞাপন হল **নৈর্ব্যক্তিক**। বিজ্ঞাপনের প্রকৃতি যাই হোক না কেন, এটি কোনো ব্যক্তিবিশেষের দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয় না।

তৃতীয়ত বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে এর উৎস অর্থাৎ প্রবর্তককে সহজেই চিহ্নিত করা যায়।

৪.৭ বিজ্ঞাপনের তাৎপর্য ও কাজ (Significance and Functions of Advertisement)

বর্তমান যুগকে বলা হয় বিজ্ঞানের ও বিজ্ঞাপনের। বিজ্ঞান তার গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন

পণ্য সৃষ্টি করে, আর বিজ্ঞাপন সেই সৃষ্টির বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়, তাদের মনে আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করে ও পণ্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করে। পণ্যের চাহিদা বজায় রাখা ও চাহিদা বৃদ্ধি করা উভয় ধরনের কাজ-ই বিজ্ঞাপন করে থাকে। এছাড়াও বিজ্ঞাপন ক্রেতা ও উৎপাদনকারীর মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবেও কাজ করে। বিজ্ঞাপনের প্রধান প্রধান কাজগুলি হল :

1. **চাহিদা সৃষ্টি** (Creation of demand) **:** সম্ভাব্য ক্রেতার কাছে বিজ্ঞাপন হল পণ্য ক্রয়ের এক আবেদন, এক আমন্ত্রণ। বিজ্ঞাপন পণ্য সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য ভোক্তা বা ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেয় ও পণ্যের প্রয়োজনীয়তা, উপযোগিতা, গুণাগুণ ইত্যাদি জানিয়ে মানুষের মনে চাহিদার সৃষ্টি করে। এই চাহিদা সৃষ্টির ফলেই ভবিষ্যতে পণ্য বিক্রয়ের পথ সুগম হয় ও কারবারের সমৃদ্ধি ঘটে।

2. **বিক্রয় বৃদ্ধি** (Increase in sales) **:** বিজ্ঞাপনের একটি প্রধান লক্ষ্য হল পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধি করা। বিজ্ঞাপন মানুষের মনের সুপ্ত বাসনাকে জাগিয়ে তোলে ও পণ্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করে। বিজ্ঞাপন এ কারণে বিক্রয়-বৃদ্ধির একটি শক্তিশালী ও বহুল ব্যবহৃত হাতিয়ার হিসেবে গণ্য হয়। বিক্রয় বৃদ্ধি যেহেতু মুনাফা বৃদ্ধির সাথে সরাসরি যুক্ত সেহেতু বলা যায় বিজ্ঞাপন মুনাফা বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে।

3. **নতুন পণ্যের উপস্থাপন** (Introduction of new product) **:** বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে নিত্য নতুন পণ্যের আবিষ্কার ও উৎপাদন ঘটছে। একটি নতুন পণ্য বাজারে উপস্থাপিত করলেই সাথে সাথে তার বিক্রয় শুরু হয় না, কারণ ঐ পণ্যের উপযোগিতা সম্বন্ধে ক্রেতার কোনো ধারণা থাকে না। ফলস্বরূপ বাজারে ঐ পণ্যের কোনো চাহিদা থাকে না, ফলে পণ্যটি বিক্রয় হয় না। বিজ্ঞাপন নতুন পণ্যকে বাজারে ও ক্রেতার সাথে পরিচিত করায় ও পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করে বিক্রয়ের পথ সুগম করে।

4. **উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস** (Reduction of production cost) **:** বিজ্ঞাপনের ফলে পণ্যের চাহিদা যদি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় তাহলে পণ্যের গণ-উৎপাদন (mass production) সম্ভব হয়। এরূপক্ষেত্রে সাধারণত **'ক্রমঃহ্রাসমান উৎপাদন ব্যয় বিধি'**র (Law of deminishing cost) সুফল পাওয়া যায় এবং পণ্যের উৎপাদন ব্যয় কমতে থাকে। ফলে ক্রেতা কম দামে পণ্যটি পেতে পারে।

5. **চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য** (Equilibrium between demand and supply) **:** বিজ্ঞাপন চাহিদা সৃষ্টি করে, চাহিদার সংরক্ষণ করে ও চাহিদা বৃদ্ধি করে। কারবার ঐ চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের যোগান সুনিশ্চিত করে। এর ফলে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য আসে। ধারাবাহিক বিজ্ঞাপন ধারাবাহিক চাহিদা সৃষ্টি করায় ধারাবাহিক যোগানের প্রয়োজন দেখা দেয়, যা আবার ধারাবাহিক উৎপাদন ঘটাতে সাহায্য করে।

6. **ক্রেতাস্বার্থ রক্ষা** (Safeguard of customers' interest) : বিজ্ঞাপন বিভিন্ন উৎপাদকের মধ্যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে। তীব্র প্রতিযোগিতার বাজারে ক্রেতামুখী বিপণনের সৃষ্টি হয়। ফলে ক্রেতাস্বার্থ রক্ষার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

7. **কারবারের সুনাম বৃদ্ধি** (Enhances goodwill) : বিজ্ঞাপনের ফলে পণ্য ও পণ্য উৎপাদক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে মানুষ জানতে পারে ও ক্রমাগত বিজ্ঞাপনের ফলে এই নামগুলি তাদের পরিচিত হয়ে পড়ে। কারবারের পরিচিতি যত বাড়ে, সুনামও তত বাড়ে। কারণ পণ্যের মান সম্পর্কে তাদের মধ্যে এক ধরনের আস্থা গড়ে উঠার সাথে সাথে বাজারে পণ্য ও উৎপাদকের উন্নত ভাবমূর্তিও গড়ে উঠে।

8. **জাতীয় উন্নয়ন** (National growth) : একটি দেশের জাতীয় উন্নয়নে বিভিন্ন বিষয় জড়িত থাকে। জাতীয় উন্নয়ন বা জাতীয় বিকাশ মূলত দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল—**অর্থনৈতিক বিকাশ** ও **সাংস্কৃতিক বিকাশ**। বিজ্ঞাপন উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। একদিকে বিজ্ঞাপন পণ্যের নতুন নতুন চাহিদা সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদন ব্যবস্থাকে সচল রাখতে সাহায্য করে। এর ফলে নতুন নতুন কলকারখানা স্থাপিত হয় ও শিল্পের অগ্রগতি ও বিকাশ ঘটে, যা অর্থনৈতিক বিকাশের নামান্তর। আবার অপরদিকে বিজ্ঞাপন একটি কলা বা শিল্প এবং এর সাংস্কৃতিক আবেদন কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। এছাড়া বিজ্ঞাপন সাংস্কৃতিক বিকাশের আর্থিক দিকটি দেখে।

9. **জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি** (Increase in the standard of living) : বিজ্ঞাপনের কাজ একদিকে যেমন শিল্পের বিকাশে সহায়তা করা অপরদিকে বিজ্ঞাপন নিজে আবার একটি শিল্প। শিল্পের বিকাশের ফলে নতুন নতুন কলকারখানা স্থাপিত হয়। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় নতুন নতুন পণ্য পাওয়া সহজ হয়। এর ফলে বহু মানুষের কর্মসংস্থান ঘটে। ফলে তাদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

10. **শিল্পের বিকাশ** (Growth of art) : বিজ্ঞাপনকে শিল্প (Industry) ও কলা (Art) উভয় নামেই অভিহিত করা হয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিজ্ঞাপনের ভূমিকা যখন আলোচনা করা হয় তখন একে শিল্প (Industry) বলা হয়। আবার বিজ্ঞাপনের কাজ হল কুশলী শিল্পীর, যা শিল্পকলা, চিত্রকলা, কৃষ্টি ও জ্ঞানের মিশ্রণে গড়ে তোলা হয় যাতে যাদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপনটি তৈরি করা হয় তাদের উপর স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে। দেশের বহু জ্ঞানী, গুণী শিল্পী বিজ্ঞাপনের সাথে জড়িত এবং তাঁরা বিজ্ঞাপনকে হৃদয়গ্রাহী, মনোগ্রাহী ও নান্দনিক করার জন্য নিরলস প্রয়াস চালান। বিজ্ঞাপন এই কলা বা শিল্পের বিকাশেও সাহায্য করে।

৪.৮ বিক্রয় প্রসার—অর্থ ও সংজ্ঞা (Sales Promotion—meaning and definition)

ব্যুৎপত্তিগত ভাবে প্রসার কথার অর্থ বৃদ্ধি। সুতরাং বিক্রয় প্রসার বলতে বিক্রয় বৃদ্ধিকে বোঝায়। ব্যাপক অর্থে প্রসার বলতে যে সমস্ত কাজ পণ্যের বিপণনের জন্য গ্রহণ করা হয় এবং অন্যান্য যেসব কাজ পণ্যের বাজার বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের সাথে যুক্ত তাদের বোঝায়। সংক্ষিপ্তভাবে বিক্রয় প্রসারের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা হল—'**উৎপাদক ও বিক্রয়কর্মীদের যেসব কাজের ফলে পণ্য বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, সেসব কাজকেই বিক্রয় প্রসার বলে**'। অন্যভাবে বলা যায় সম্ভাব্য ক্রেতাদের প্রয়োজন, চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য পণ্য ক্রয়ে উৎসাহিত করাই হল বিক্রয় প্রসার।

Philip Kotler তাঁর Principles of Marketing গ্রন্থে বিক্রয় প্রসার সম্বন্ধে বলেছেন—"**কোনো পণ্য বা সেবা ক্রয় বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে স্বল্পমেয়াদি প্রেরণামূলক কর্মসূচিকে বিক্রয় প্রসার বলে**"। বিজ্ঞাপন যেখানে কোনো পণ্য বা সেবা ক্রয়ের সাধারণ যুক্তিগুলি তুলে ধরে, বিক্রয় প্রসার সেখানে পণ্যটি এখনই ক্রয় করার যুক্তিগুলি তুলে ধরে। **American Marketing Association**-এর সংজ্ঞা সংক্রান্ত কমিটি **বিক্রয় প্রসারের** যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল—"নির্দিষ্ট অর্থে প্রসার বলতে সেসব বিক্রয় কাজকেই বোঝায় যেগুলি ব্যক্তিগত বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন উভয়েরই পরিপূরক হিসাবে কাজ করে এবং এদের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করে বিপণনকে আরও দক্ষ ও কার্যকরী হতে সাহায্য করে। বাতায়ন সজ্জা, মেলা ও প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতা, পরীক্ষামূলক প্রদর্শন প্রভৃতি অপৌনঃপুনিক ধরনের বিক্রয় কাজ-এর অন্তর্ভুক্ত, যেগুলি দৈনন্দিন বিক্রয় কাজের মধ্যে পড়ে না।" অর্থাৎ বিক্রয় প্রসার হল এমন কিছু বিশেষ ধরনের কাজ যেগুলি বিক্রয় বৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করে কিন্তু বিজ্ঞাপন, ব্যক্তিগত বিক্রয় ও প্রচারের কাজের সাথে যুক্ত নয়। আবার বিক্রয় প্রসার এদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক তাও বলা যায় না। কারণ এর উদ্দেশ্য হল বিজ্ঞাপন ও ব্যক্তিগত বিক্রয়কে আরও কার্যকরী রূপ দেওয়া। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বিক্রয় প্রসার হল 'একটি সীমিত সময়ের জন্য বিশেষ ক্রয়-প্রেরণামূলক ব্যবস্থা।'

৪.৯ বিক্রয় প্রসারের কৌশলসমূহ (Sales Promotion Strategies)

বিক্রয়-প্রসারের জন্য যেসব উপায় বা কৌশল বিভিন্ন ক্ষেত্রে বা স্তরে প্রয়োগ করা হয় সেগুলি নীচে তুলে ধরা হল।

(ক) ক্রেতা স্তরে (At consumer's level) : বিপণন কার্যকলাপ বাজারে অবস্থিত একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর ক্রেতা-গোষ্ঠীর (target market) উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। বিপণনের বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল পণ্য বিক্রয়। বাজারে ক্রেতার সংখ্যা বাড়াতে পারলে পণ্য বিক্রয় সহজ

হয় ও মোট বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়ে, প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জন ও উন্নতি সম্ভব হয়। ক্রেতা প্রসার কৌশল পণ্যের নতুন নতুন ক্রেতা সৃষ্টি করার উদ্যোগ নেয়। এজন্য যেসব কৌশল গ্রহণ করা হয়, সেগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কৌশল নীচে আলোচনা হল।

1. **নমুনা** (Samples) : পণ্যের গুণাগুণ যাচাই করার জন্য ও ক্রেতাদের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য পণ্যের নমুনা বিতরণ করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটি বিনামূল্যে দেওয়া হয়, আবার কখনো কখনো খুব অল্পমূল্য ধার্য করা হয়। এই নমুনা কর্মীদের দ্বারা সম্ভাব্য ক্রেতাদের মধ্যে বিতরণ করার ব্যবস্থা করা হয় অথবা অন্য পণ্যের সাথে যুক্ত করা হয় বা ডাক মারফত পাঠানো হয়। এটি বিক্রয় বৃদ্ধির একটি কার্যকরী কৌশল, কিন্তু অত্যন্ত ব্যয়বহুল।
2. **কুপন** (Coupon) : কুপন হল এক বিশেষ ধরনের ছাপানা কাগজ যা কোনো পণ্যের সাথে বা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সম্ভাব্য ক্রেতাদরে কাছে পাঠানো হয়। এই কুপনের মাধ্যমে ক্রেতাকে একটি বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়—অগ্রাধিকার বা দামে ছাড়। সাধারণত নতুন পণ্যের চাহিদা জানার জন্য বা কোনো পণ্যের বাজারে দীর্ঘকালীন স্থিতাবস্থা বজায় থাকলে কুপন বিক্রয় বৃদ্ধিতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।
3. **রিবেট বা বিশেষ ছাড়** (Rebate or Special discount) : রিবেট হল পণ্যের দাম ছাড়। উৎপাদক বিশেষ বিশেষ সময়ে বা উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে এই রিবেট দিয়ে থাকে। এর ফলে ক্রেতারা ঐ বিশেষ সময়ে সুবিধামূলক দামে পণ্য ক্রয়ের সুযোগ পায় এবং পণ্যের গণ-বিক্রয় সম্ভব হয়।
4. **প্রাইস-প্যাক** (Price-Pack) : বিভিন্ন ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতাদের ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিশেষ সুবিধার প্রস্তাব দেওয়া হয়। এই প্রস্তাব সাধারণত পণ্যের মোড়কে বা লেবেলে উল্লেখ থাকে। এটি দু-ধরনের হয়—দাম হ্রাসজনিত সুবিধা অর্থাৎ পণ্যের স্বাভাবিক দাম থেকে কম দামে পণ্যটি বিক্রয় করা অথবা প্যাকেটে পণ্যের পরিমাণ বেশি দেওয়া, যেমন—দুটি কিনলে একটি পণ্য বিনামূল্যে দেওয়া। এ সমস্তই বিক্রয় সম্প্রসারণ কৌশল। পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধি তাৎক্ষণিক করার জন্য প্রাইস প্যাক ব্যবহৃত হয়। এই সুযোগ সীমিত সময়ের জন্য বা যতদিন পণ্য মজুত থাকে ততদিন দেওয়া হয়।
5. **পারিতোষিক প্রদান** (Premiums) : বিক্রয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অনেক সময় বিক্রেতা পণ্যের সাথে নানাধরনের উপহার প্রদানের ব্যবস্থা করে। আবার অনেক সময় পণ্যাধারটি এমন করা হয় যাতে সেটি পরবর্তীকালে ক্রেতার অন্য প্রয়োজন মেটাতে ব্যবহৃত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, 'কমপ্ল্যানের সাথে একটি পেনসিল বক্স বিনামূল্যে পাওয়া যায়', 'একটি পোলার পাখার সাথে একটি দেওয়াল ঘড়ি', 'চারটি এম. আর. এফ. টায়ার কিনলে তার সাথে একটি টাইটান ঘড়ি ফ্রি' ইত্যাদি। এছাড়াও যেমন হরলিক্স-এর এক কেজি কাচের

জার এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যা পরে জলের জগ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এসব কৌশল দ্বারা ক্রেতাকে আকর্ষণ করা সহজ হয় ও এর ফলে বিক্রয় বৃদ্ধিও ঘটে।

6. **প্রতিযোগিতা** (Contest) : বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য অনেক সময় বিক্রয়কর্মী, মধ্যস্থ কারবারি ও ক্রেতাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতামূলক বিক্রয় সম্প্রসারণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ক্রেতাদের মধ্যে কোনো জনপ্রিয় বিষয় সম্পর্কে অভিমত অথবা সংশ্লিষ্ট পণ্যের উপর বিভিন্ন প্রশ্নের সঠিক উত্তরদানের জন্য প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়। অনেক সময় এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য ক্রয়ের প্রমাণ পেশ করতে হয়। প্রতিযোগিতায় যারা সফল হয় তাদের নগদে অথবা পণ্যে অথবা অন্য কোনোভাবে পুরস্কৃত করা হয়।

7. **আনুগত্যের পুরস্কার** (Prize for loyalty) : পণ্যের বাজার সংরক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠান যখন তার ক্রেতাদের ধরে রাখতে চায় অর্থাৎ তারা যাতে প্রতিযোগী উৎপাদকদের পণ্য বা সেবার প্রতি আকৃষ্ট না হয় এবং বারে বারে তাদের পণ্যই ক্রয় করে তার জন্য পৃষ্ঠপোষকতার পুরস্কার প্রদান করে। আর্থিক সুবিধা বা অন্যান্য সুবিধার মাধ্যমে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

8. **বিনামূল্যে পরীক্ষা** (Free trial) : এ ধরনের বিক্রয় প্রসার কৌশল সবচেয়ে বেশি দেখা যায় মোটর সাইকেল, স্কুটার প্রভৃতি দ্বিচক্রযানের ক্ষেত্রে। সম্ভাব্য ক্রেতারা যাতে পণ্যটি ক্রয়ের আগে পণ্যটির গুণাগুণ যাচাই করার সুযোগ পায় সেজন্যই এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ক্রেতা পণ্যটি পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে পণ্য ক্রয় করবে এই ধারণা এই কৌশলে কাজ করে।

9. **পণ্যের ওয়ার‍্যান্টি** (Product warranty) : এটি হল একটি বহুলগ্রাহ্য প্রসার কৌশল। কারণ এর সাথে পণ্যের গুণগত মানের একধরনের সম্পর্ক থাকে। যে পণ্যের ওয়ার‍্যান্টি যত দীর্ঘকালীন হয় পণ্যটির গুণগত মান সম্বন্ধে ক্রেতার মনে ততটাই উঁচু ধারণা গড়ে উঠে। সেজন্য পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধির একটি কৌশল হিসাবেও এটি ব্যবহৃত হয়।

10. **ব্যবসায়িক স্ট্যাম্প** (Trading Stamp) : স্ট্যাম্পের মাধ্যমে ক্রেতাদের পারিতোষিক প্রদানও বিক্রয় প্রসারের একটি কৌশল। বিক্রেতা মোট বিক্রয়ের পরিমাণের উপর ক্রেতাকে নির্দিষ্ট সংখ্যক স্ট্যাম্প প্রদান করে যেগুলি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে ভাঙ্গানো যায়। ক্রেতা ঐ নির্দিষ্ট কেন্দ্রে স্ট্যাম্পগুলি ভাঙ্গিয়ে নগদ অর্থ লাভ করে।

11. **লটারি** (Lottery) : বিক্রয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সাম্প্রতিককালে অনেক উৎপাদক প্রতিষ্ঠানই এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করে। একটি নির্দিষ্ট মূল্যের বা তার থেকে অধিক মূল্যের পণ্য ক্রয় করলে লটারিতে অংশগ্রহণ করা যায়। ক্রেতা পণ্যের সাথে যে ক্যাশ মেমো পায় তার নম্বরগুলির উপর নির্দিষ্ট সময়ের পর লটারি করা হয় ও বিজয়ী ক্রেতাকে পুরস্কৃত করা হয়।

12. **ক্র্যাশ কার্ড** (Crash Card) : পণ্য ক্রয়ের সাথে ক্রেতাকে একটি ক্র্যাশ কার্ড দেওয়া হয়। ক্র্যাশ কার্ডের মোমের আবরণ ঘষে তুলে ফেললে কার্ডের উপর লেখা ফুটে ওঠে। সাধারণত কোনো পুরস্কার বা ছাড়ের উল্লেখ থাকে ঐ ক্র্যাশ কার্ডে এবং ক্রেতাকে সাথে সাথেই ঐ ছাড় বা পুরস্কার দেওয়া হয়।

(খ) ডিলার স্তরে (At Dealer's level) : এই কৌশল মূলত মধ্যস্থ কারবারিদের মধ্যে প্রয়োগ করা হয়, যাতে তারা পণ্যের বিক্রয় বাড়াতে সচেষ্ট হয়। এর অন্তর্ভুক্ত কৌশলগুলি হল :

1. **দাম ছাড়** (Price-off) : কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্রেতাকে তালিকা মূল্যের উপর বিক্রেতা একটি নির্দিষ্ট হারে ছাড় দেয়। সাধারণত একসাথে বেশি পরিমাণ পণ্য বিক্রয়ের জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

2. **ভাতা** (Allowance) : খুচরা বিক্রেতা যখন কোনো পণ্যের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বা প্রচারের কাজে যুক্ত থাকে তখন তাকে এধরনের ভাতা দেওয়া হয়। যেমন পণ্যের বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য 'বিজ্ঞাপন ভাতা', দোকানে পণ্য সাজিয়ে প্রদর্শনের জন্য 'প্রদর্শন ভাতা', পণ্য বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার জন্য 'বিক্রয় ভাতা' ইত্যাদি।

3. **বিনামূল্যে পণ্য** (Free goods) : বিক্রয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য ক্রয় করলে বিক্রেতা ক্রেতাকে কিছু অতিরিক্ত পণ্য বিনামূল্যে প্রদান করে। এই ধরনের বিক্রয় কর্মসূচির ব্যাপক ব্যবহার কারবারি জগতে দেখা যায়। একটি নতুন পণ্য প্রবর্তনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

(গ) বিক্রয় কর্মীদের স্তরে (At Salesman's level) : পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধিতে বিক্রয়কর্মীদের এক বিশেষ ভূমিকা থাকে। কারণ বিক্রয়কর্মীরা ক্রেতা ও মধ্যস্থ কারবারিদের সাথে এক ধরনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। এদের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকার ফলে বাজারের গতি-প্রকৃতি ও অবস্থা বোঝা তাদের পক্ষে সহজ হয়। পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য বিক্রয়কর্মীদের মধ্যে যেসব কৌশল প্রয়োগ করা হয়, তাদের মধ্যে কয়েকটি জনপ্রিয় কৌশল নীচে উল্লেখ করা হল—

1. **বিক্রয়-সভা** (Sales meeting) : বিক্রয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিক্রয়কর্মীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে। কারবারি জগতে প্রতিষ্ঠিত বিক্রয়কর্মীদের উৎসাহিত করতে ও আরও কার্যকরী ভূমিকা পালনের জন্য বিক্রয় সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় তাদের বিক্রয় সংক্রান্ত সমস্যা আলোচনা করা হয় ও সমাধানের পথ খুঁজে বের করা হয়।

2. **প্রতিযোগিতা** (Contest) : বিক্রয়কর্মীদের মধ্যে একধরনের প্রতিযোগিতার বাতাবরণ সৃষ্টি করা ও এর মাধ্যমে বিক্রয় বৃদ্ধি ঘটানো একটি অতি প্রচলিত কৌশল। সাধারণত প্রত্যেক বিক্রয়কর্মীর জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য বিক্রয়ের লক্ষ্য (target) স্থির করে দেওয়া হয়। ঐ বিক্রয়-লক্ষ্য পূরণ করতে না পারলে তাকে দক্ষ বিক্রয়কর্মী বলা হয় না। অপরদিকে যে

বিক্রয়কর্মী সবচেয়ে বেশি পণ্য বিক্রয় করতে সমর্থ হয় তাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও প্রতিযোগিতার বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরনের পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকে যাতে বিক্রয়কর্মীরা কোনোভাবেই নিরুৎসাহিত না হয়।

3. **পণ্য প্রদর্শন** (Product demonstration) **:** বিক্রয়কর্মীরা পণ্যের উপযোগিতা ও কার্যকারিতার চাক্ষুষ প্রমাণ দেওয়ার জন্য ক্রেতাদের সামনে পণ্যটি প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করে। এর মাধ্যমে ক্রেতাকে পণ্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করা ও ক্রেতার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা সহজ হয়। ফলে পণ্যের বিক্রয়-বৃদ্ধি ঘটে এবং প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়।

৪.১০ সারাংশ

উৎপাদক পণ্য উৎপাদন করে ক্রেতাদের প্রয়োজন, চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা মেটানোর জন্য। কিন্তু পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে এটিই যথেষ্ট নয়। সফল বিপণন ব্যবস্থার মধ্যে যে গুণগুলি বর্তমান থাকে তা হল সঠিক প্রসারের মাধ্যমে সঠিক পণ্য, সঠিক দামে, সঠিক জায়গায় ও সঠিক সময়ে ক্রেতাদেরকে সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি। বর্তমানে তীব্র প্রতিযোগিতার বাজারে পণ্য নিজে থেকে বিক্রয় হয় না। বিপণনকারীর পণ্যের সাথে ক্রেতাদের সংযোগ ঘটানোর প্রক্রিয়াই হল বিপণন প্রসার। এই প্রসার কৌশলের বিভিন্ন বিবেচ্য বিষয় রয়েছে এবং সেগুলি হল পণ্য বা সেবা, ক্রেতা, প্রতিষ্ঠান ও বণ্টন প্রণালী। এই কৌশলগুলি প্রয়োগের জন্য প্রতিষ্ঠানকে উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয় এবং যার ফলে পণ্য বিক্রয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব হয়। প্রসার মিশ্রণের উপাদানের মধ্যে অন্যতম উপাদান হল বিজ্ঞাপন যার মাধ্যমে তথ্য জ্ঞাপন সম্ভব। অর্থাৎ ঐ প্রতিষ্ঠান যে সকল পণ্য বা সেবা প্রস্তুত করে সেই সৃষ্টির বার্তা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছায়, মানুষের মনে আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয় ও তারা পণ্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ হয়। এরই সাথে যুক্ত হয় বিক্রয় প্রসার যা বিক্রয় বৃদ্ধিকে বোঝায়। উৎপাদক ও বিক্রয়কর্মীর যেসব কাজের ফলে পণ্য বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, সেইসব কাজকে বিক্রয় প্রসার বলে। উপরোক্ত বিষয়গুলি এই এককে আলোকপাত করা হয়েছে।

৪.১১ অনুশীলনী

ক) বহুপছন্দ ভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। প্রসার মিশ্রণের অপর নামটি কী?

ক) যোগাযোগ মিশ্রণ

খ) বিক্রয় মিশ্রণ

গ) বিজ্ঞাপন

ঘ) কোনোটিই নয়

২। নিম্নলিখিত কোন্‌টি প্রচার কৌশলের বিবেচ্য বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয় না?

ক) পণ্য বা সেবা খ) সময়

গ) ক্রেতা ঘ) প্রতিষ্ঠান

৩। নিম্নলিখিত কোন্‌টি বিজ্ঞাপনের তাৎপর্য হিসাবে বিবেচনা করা হয় না?

ক) চাহিদা সৃষ্টি খ) বিক্রয় বৃদ্ধি

গ) মানবসম্পদ হিসাবনিকাশকরণ সম্ভব ঘ) ক্রেতাস্বার্থ রক্ষা

৪। উৎপাদক ও বিক্রয়কর্মীদের যেসব কাজের ফলে পণ্য বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, সেসব কাজকে _________ বলে।

ক) বিক্রয় প্রসার খ) পণ্য উৎপাদন

গ) ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি ঘ) সমহার উৎপাদন বিধি

৫। পণ্যের নমুনা বিতরণ, কুপন, রিবেট, দাম কমানো ইত্যাদি বিক্রয় প্রসারের কোন্‌ হাতিয়ার হিসাবে গণ্য হয়?

ক) ক্রেতা প্রসার খ) বাণিজ্য প্রসার

গ) বিক্রেতা প্রসার ঘ) বিক্রয় শক্তির প্রসার

খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

১। বিপণন প্রসারের সংজ্ঞা দিন।

২। বিপণন প্রসারের দুটি গুরুত্ব উল্লেখ করুন।

৩। বিপণন প্রসারের দুটি বিবেচ্য বিষয় উল্লেখ করুন।

৪। বিজ্ঞাপনের সংজ্ঞা উল্লেখ করুন।

৫। বিজ্ঞাপনের দুটি কার্যাবলী সম্বন্ধে লিখুন।

৬। বিক্রয় প্রসার বলতে কী বোঝায়?

৭। বিক্রয় প্রসারের ক্ষেত্রে নমুনা বলতে কী বোঝায়?

৮। পারিতোষিক প্রদান বলতে কী বোঝেন?

৯। প্রাইস-প্যাক কী?

১০। ক্র্যাশ কার্ড বলতে কী বোঝায়?

গ) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

১। বিপণন প্রসারের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

২। প্রসার কৌশলের বিবেচ্য বিষয়সমূহ কী কী?

৩। বিজ্ঞাপনের কার্যাবলী আলোচনা করুন।

৪। ক্রেতাস্তরে বিক্রয় প্রসারের কৌশলগুলি আলোচনা করুন।

৫। ডিলার ও বিক্রয়কর্মীদের স্তরে প্রসার কৌশলগুলি কী কী?

একক ৫ ❑ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা (Human Resource Management) মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা (Concept of Human Resource Management)

গঠন

৫.১ উদ্দেশ্য

৫.২ প্রস্তাবনা

৫.৩ মানবসম্পদ—ধারণা ও অর্থ

৫.৪ মানবসম্পদ—সংজ্ঞা

৫.৫ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি

৫.৬ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার পরিধি

৫.৭ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী

৫.৮ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব

৫.৯ সারাংশ

৫.১০ অনুশীলনী

৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি থেকে আপনারা নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হবেন—

- মানবসম্পদ—ধারণা ও অর্থ
- মানবসম্পদের সংজ্ঞা
- মানবসম্পদের প্রকৃতি
- মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার পরিধি
- মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী
- মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব

৫.২ প্রস্তাবনা

মানব উপাদান যন্ত্রপাতিকে চালিত করার ক্ষেত্রে চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করে। সেই অর্থে

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনার কাজ হিসাবে গণ্য করা হয়। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা হল ব্যবস্থাপনার সেই কৌশল যার সাহায্যে সংগঠন সুযোগ্য ও শক্তিশালী কর্মী সংগ্রহ করতে পারে, তাকে কাজে উৎসাহ দিতে পারে, তার সার্বিক বিকাশসাধন ও তাকে যোগ্যকর্মী হিসাবে গড়ে তুলতে পারে। সেই অর্থে বলা যেতে পারে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা কর্মীদের শ্রেষ্ঠটুকু আদায় করার একটি কৌশল। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কার্যাবলী আছে যেমন, ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী, ব্যবহারিক কার্যাবলী এবং পরামর্শ প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী। এই সব কার্যাবলীর মাধ্যমে মানবসম্পদের কাম্য ব্যবহার সম্ভব হয়। সুতরাং এ কথা অনস্বীকার্য যে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অসীম। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে ধারণা এই একক থেকে পাওয়া যাবে।

৫.৩ মানব সম্পদ সম্পর্কে ধারণা ও অর্থ (Human Resource—The Concept and Meaning)

অর্থনীতিবিদ **জন আর কমনস্** (John R. Commons) 1983 সালে মানবিক সম্পদ শব্দবন্ধটি প্রয়োগ করেছিলেন। Wal-Mart-এর প্রতিষ্ঠাতা **স্যাম ওয়াল্টন** (Sam Walton) এক সময় বলেছিলেন যে 'মানুষ হল চাবিকাঠি' (People are the key)। প্রযুক্তি (Technology) ক্রয় করা যায় বা তার অনুলিপিও (Copy) হয়। অন্যদিকে মানুষের কোনো অনুলিপি হয় না। যদিও এখনকার দিনে কোনো মানুষের মতো অবিকল আরেকজন মানুষ তৈরি করা যায় প্রযুক্তির সাহায্যে যাকে ক্লোন (Clone) বলে। তবে প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি মানুষের সাথে স্বাভাবিক মানুষের যে পার্থক্য তা হল স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে থাকে ভাবাবেগ, ব্যক্তিত্ব, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ইত্যাদি। এই সকল মানবিক গুণাবলি প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি মানুষের মধ্যে থাকে না। সুতরাং কোনো সংগঠন গড়ে উঠতে হলে স্বাভাবিক মানুষের প্রয়োজন এবং স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে যে সকল গুণাবলি থাকে তার সাহায্যে সংগঠন গড়ে ওঠে, সংগঠনের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়, সংগঠন নতুন ধরনের উদ্ভাবনী কাজের সাথে যুক্ত হতে পারে ইত্যাদি। তাই মানুষ হল সেই সম্পদ যার সাহায্যে সংগঠনের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। এখানে মানবিক সম্পদ বলতে মানুষের বাহ্যিক আবরণকে শুধু বোঝায় না। মানুষের মধ্যে যে জ্ঞান, দক্ষতা, সৃজনশীল ক্ষমতা, প্রতিভা ইত্যাদি থাকে এবং এই সকল গুণাবলির সাহায্যে মানুষ যে কর্মযজ্ঞে সামিল হয় ও তার সংগঠনের উন্নতিকল্পে নিজেদের নিয়োজিত করে সামগ্রিকভাবে তাকে মানবিক সম্পদ বলে।

৫.৪ সংজ্ঞা (Definition)

উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপককে সবচেয়ে বেশি যে উপাদানের উপর নজর ও নিয়ন্ত্রণ রাখতে হয়

তা হল মানব উপাদান, যাকে আমরা মনুষ্যশক্তি বলে থাকি। প্রতিষ্ঠানের মনুষ্যশক্তি নিয়োগ ও সেই শক্তিকে কার্যকরীভাবে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের সাথে সমন্বয় ঘটানো কর্মী ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত বিষয়। 'কার্যকরীভাবে' কর্মীকে কাজে লাগানো বিষয়টি কর্মী সংগ্রহ ও নির্বাচন থেকে শুরু হয় এবং সাংগঠনিক স্বার্থের সাথে কর্মী-সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে তা শেষ হয়। এই বিশেষ কাজ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপকের উপর ন্যস্ত থাকে। সুতরাং, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা হল ব্যবস্থাপনার সেই কৌশল যার সাহায্যে সংগঠন সুযোগ্য ও শক্তিশালী কর্মী সংগ্রহ করতে পারে, তাকে কাজে উৎসাহ দিতে পারে, তার সার্বিক বিকাশসাধন ও তাকে যোগ্যকর্মী হিসাবে গড়ে তুলতে পারে। এই কাজ এমনভাবে সম্পাদন করতে হবে যার ফলে সর্বাধিক নিপুণতার সাথে ও সর্বনিম্ন ব্যয়ে সংগঠনের উদ্দেশ্যপূরণ সম্ভব হয়।

'মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা' এমন একটি শব্দ-বন্ধন যা যে-কোনো সংগঠনের ক্ষেত্রে অন্যতম চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করে। এ প্রসঙ্গে **পিটার ড্রাকার** (Peter Drucker) বলেছেন: "শুধু মনুষ্য সম্পদই বিস্তৃতিলাভ করতে পারে। মানুষ ছাড়া অন্যান্য সম্পদের উত্তম ব্যবহার বা খারাপ ব্যবহার করা যায়, কিন্তু তাদের জন্য যে পরিমাণ কাঁচামাল কাজে লাগানো হয়েছিল তার থেকে বেশি উৎপাদন সম্ভব নয়। অন্যান্য সমস্ত সম্পদের মধ্যে একমাত্র মানুষই বাড়তে ও সমৃদ্ধ হতে পারে।" *(...the sources capable of enlargement can only be human resources.... They (all other resources) canbe better utilised or worse utilised, but they can never have an greater than the sum of the inputs ...... Man alone of all resources available to him, can grow and develop)*।

এককথায় কর্মী ব্যবস্থাপনা মানবিক সম্পদ বিকাশের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সেজন্য ডেল বেক (Dale Beach) বলেছেন, "মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার অর্থ হল মানব-সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার।" *(Human Resource Management means the optimum utilisation of the human resources).*

নীচের রেখাচিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি দেখানো হল :

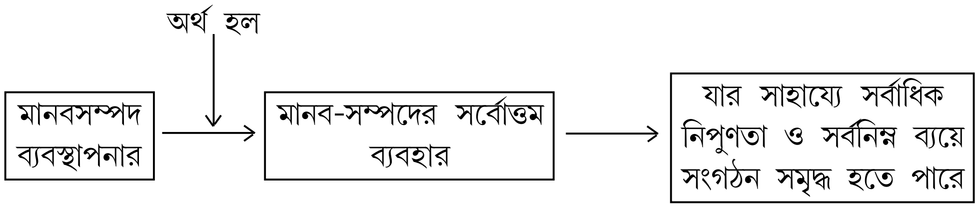

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যে সকল বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব তাঁদের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন নীচে সেসম্পর্কে কিছু ধারণা দেওয়া হল :

- **গ্যারি ডেসলার** (Gary Dessler) মনে করেন কর্মী সংগ্রহ, তাদের প্রশিক্ষণ, মূল্যায়ন, অর্থ প্রদান, কর্মীদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক, তাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রদান ইত্যাদি বিষয়ের সাথে যে ব্যবস্থাপনা যুক্ত তাকে মানবিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা বলে (Human resource management

in the process of acquiring, training, appraising and compensating employees, and of attending to their labour relation, health and safety, and fairness concerns)।

- **মিলকোভিচ** এবং **বড্রে** (Milkovich and Boudreau) বলেছেন যে, এটি একটি ধারাবাহিক পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধান্ত যা কাজের সম্পর্ক স্থাপন করায়, সংগঠনের এবং কর্মীদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করার জন্য তাদের মধ্যে গুণগত মানের বিকাশ ঘটায় *(... a series of integrated decisions that form the employment relationship; their quality contributes to the ability of the organisation and employees to acheive their objectives)*।
- **গ্রাহাম** (Graham)-এর মতে, "মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রধান উদ্দেশ্য হল, সংগঠনে কর্মীদের এমনভাবে ব্যবহার করা যার ফলে সংগঠনের মালিক কর্মীদের কাছ থেকে তাদের সম্ভাব্য সবচেয়ে কার্যকরী ক্ষমতা যেমন আদায় করে নিতে পারেন, তেমনি অপর দিকে কর্মীরা সংগঠন থেকে তাদের কাজের জন্য পার্থিব (material) এবং মানসিকভাবে পুরস্কৃত হতে পারেন।" *(The purpose of HRM is to ensure that the employees of an organisation are used in such a way that the employer obtains the greatest possible benefit from the abilities and the employees obtain both material and psychological rewards from their work.)*
- **বুচানন** এবং **হাইজানস্কি** (Buchanan and Huczynski)-এর মতে, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা হল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি অবস্থান যার সাহায্যে প্রতিষ্ঠানের কর্মী সংক্রান্ত বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ নীতি প্রতিষ্ঠা করা যায়, যা সংগঠন চালানোর কৌশলকে সাহায্য করে। *(HRM is a managerial perspective which argues the need to establish an integrated series of personnel politics to support organisational strategy.)*
- **ফ্লিপো** (Flippo)-এর মতে, "কর্মী সংগ্রহ, উন্নতি, অনুপ্রেরণা, ক্ষতিপূরণ, সংযুক্তিকরণ ও তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরিকল্পনা, নির্দেশদান এবং নিয়ন্ত্রণ হল মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা যা সংগঠন, ব্যক্তি ও সামাজিক উদ্দেশ্য পূরণে সাহায্য করে।" *(HRM is the planning, organising, directing and controlling of procurement, development, motivation, compensation, integration and maintenance of people for the purpose of contributing to organisation, individual and social goals.)*

৫.৫ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি (Nature of Human Resource Management)

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে **আরমস্ট্রং** (Armstrong) বলেছিলেন যে,

সংগঠনের অন্যতম প্রধান সম্পদ, যাকে আমরা সংগঠনের কর্মী হিসাবে জানি, তাদেরকে সংগ্রহ করা, উন্নত করা, পরিচালনা করা, অনুপ্রেরণা দেওয়া এবং তাদের কাছ থেকে সংগঠনের উন্নতি সম্পর্কে অঙ্গীকার আদায় করার যে কৌশল তাকে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বলে। *(Human resource management can be defined as a strategic approach to acquiring, developing, managing, motivating and gaining commitment of the organisation's key resource—the people who work is and for it.)*

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি সম্বন্ধে যে ধারণা পাওয়া যায় নীচে সেগুলি আলোচিত হল :

1. মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা হল নির্দিষ্ট নীতি এবং কৌশল যা সংগঠনের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করে।
2. মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ব্যাপ্তি বৃহৎ। এই ব্যবস্থাপনা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কোনো বিভাগের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর কাজ এবং ব্যাপ্তি সংগঠনের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে। এই ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নীচুতলার কর্মী থেকে শুরু করে উঁচুস্তরের কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
3. মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল মানুষ বা মানবসম্পদ। এই ব্যবস্থাপনা ব্যক্তি এবং সংগঠনের মধ্যে এমন বন্ধন তৈরি করে, যার ফলে ব্যক্তি যেমন তার লক্ষ্যপূরণে সমর্থ হয়, তেমনি সংগঠনও তার উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে সমর্থ হয়।
4. ব্যবস্থাপনার অন্যতম কার্য হিসাবে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনাকে বিবেচনা করা হয়।
5. মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা একটি অবিরত কার্যধারা। কর্মীদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবিরত অভিহিত করা, আধুনিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে তাদের সাহায্য করা, যোগ্য কর্মীকে পুরস্কৃত করা, তাদেরকে স্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশ প্রদান করা ইত্যাদি অবিরত কর্মপ্রবাহ, যা মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার কাজের মধ্যে পড়ে।
6. মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা কলা ও বিজ্ঞানের কার্যকরী মিশ্রণ।
7. মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা কর্মীদের শ্রেষ্ঠটুকু আদায় করার একটি কৌশল।
8. কর্মীকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজে নিয়োগ করা ও সেই কাজে তাকে দক্ষ করে তোলা মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ।

৫.৬ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার পরিধি (Scope of Human Resource Management)

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার পরিধি ব্যাপক। কর্মীরা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করা থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠান

থেকে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিষয় মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত। এই ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত যেসব বিষয় প্রাধান্য পায় সেগুলি হল—মানবসম্পদ পরিকল্পনা, কাজের বিশ্লেষণ ও পরিকল্পনা গ্রহণ, কর্মী নির্বাচন ও কর্মী সংগ্রহ, প্রশিক্ষণ, কার্যসম্পাদন পর্যালোচনা করা, কর্মীদের পারিশ্রমিক, উৎসাহদান, নিরাপত্তা প্রদান ও সুস্থ শিল্প-সম্পর্ক বজায় রাখা। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার পরিধি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে **আমেরিকান সোসাইটি ফর ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট** সংস্থা নয়টি ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করেছে, যাকে **এইচ. আর. এম. মডেল** (HRM Model) বলা হয়। এই মডেলের মূল লক্ষ্য হল নয়টি ক্ষেত্রের উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মীদের কাজের ক্ষেত্রের গুণগত মান বৃদ্ধি করা, কর্মীদের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করা এবং সর্বোপরি আত্মপ্রকাশের আরও সুযোগ বৃদ্ধি করা। এই মডেলকে মনুষ্যশক্তি চক্র (Human Resource Wheel) হিসাবে অভিহিত করা হয়। নীচে মানবসম্পদ চক্র সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া হল।

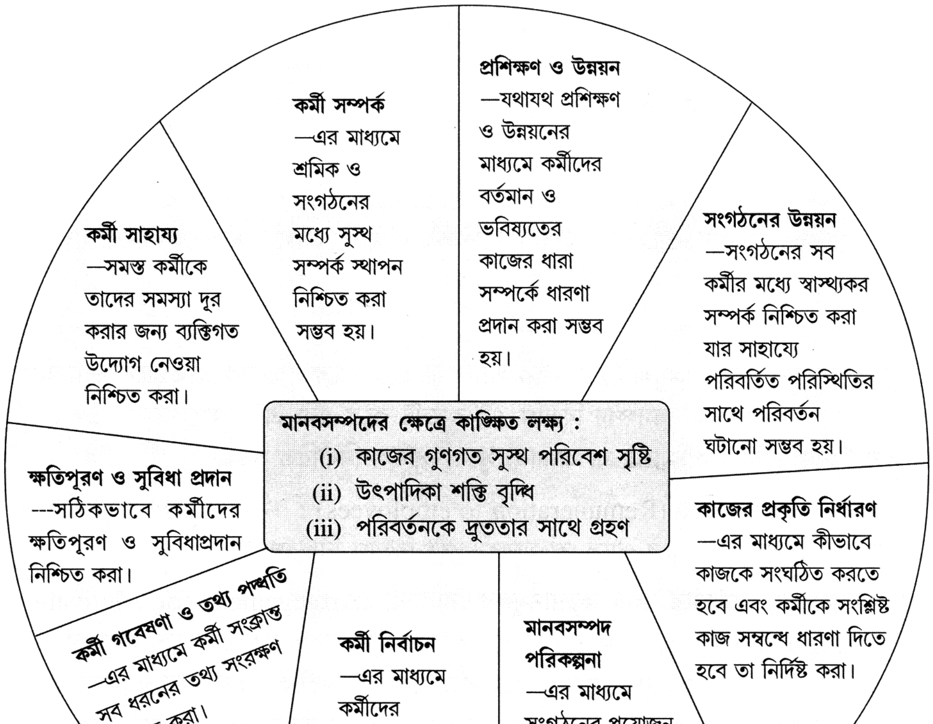

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার পরিধি সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হল :

1. **মানবসম্পদ পরিকল্পনা** (Human Resource Planning) : মানবসম্পদ পরিকল্পনা হল সেই কর্ম প্রক্রিয়া যার সাহায্যে সংগঠনের সার্বিক উন্নতির জন্য সঠিক সংখ্যায় উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী নিয়োগ করা সম্ভব হয়।
2. **কাজের বিশ্লেষণ** (Job analysis) : মানবসম্পদ পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ কাজের ক্ষেত্র হল কর্মীদের কাজের বিশ্লেষণ করা। কোম্পানিতে প্রতিটি কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করা হল কাজের বিশ্লেষণ। কাজের বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ হলে কোম্পানি কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত কাজে হাত দেয়।
3. **কর্মী সংগ্রহ ও নির্বাচন** (Recruitment and selection) : কাজের বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ হলে কোম্পানি প্রয়োজনমতো কর্মী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেয়। বিজ্ঞাপনের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য আবেদনপত্র জমা দেয় এবং তারপর তাদের ইন্টারভিউ নেওয়া হয়। যোগ্যব্যক্তিকে ইন্টারভিউ-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করা হয়।
4. **অভিযোজন এবং উপস্থাপন** (Orientation and Induction) : কর্মী একবার নির্বাচিত হয়ে গেলে তাকে কোম্পানি সম্পর্কে জ্ঞাত করানো হয়। প্রতিষ্ঠানের কর্ম সংস্কৃতি, কোম্পানি কর্মীর কাছ থেকে কী চায় ইত্যাদি বিষয় কর্মীকে জানানো হল অভিযোজন এবং উপস্থাপন, যা মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার কাজের পরিধির অন্তর্গত।
5. **প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন** (Training and Development) : যে কাজের জন্য কর্মী নির্বাচিত এবং নিয়োজিত হয়েছে, তাদেরকে যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাজ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়ে থাকে। যার ফলে কাজের গুণগত মান যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি উন্নয়ন সম্ভব হয়।
6. **কার্যসম্পাদন পর্যালোচনা** (Performance Appraisal) : কর্মীদের কাজের পর্যালোচনা (প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী) 1 বছর পর করা হয়ে থাকে। অনেক প্রতিষ্ঠানে তার আগে বা পরেও করা হয়। মানবসম্পদ বিভাগ এই কাজটি করে এবং এই পর্যালোচনার উপর দাঁড়িয়ে কর্মীদের ভবিষ্যৎ প্রমোশন বা অন্যান্য সুযোগসুবিধা নির্ধারিত হয়।
7. **কর্মীদের পারিশ্রমিক** (Remuneration to employees) : কর্মীরা কাজের পরিপ্রেক্ষিতে কত অর্থ পারিশ্রমিক হিসাবে পাবে তা মানবসম্পদ বিভাগ নির্ধারণ করে।
8. **অনুপ্রেরণা, কর্মীদের জন্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থা** (Arrangement for Motivation & Welfare of Employees) : কর্মীদেরকে কাজে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাদের অনুপ্রেরণা দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। মানবসম্পদ বিভাগের অন্যতম কাজ হল কর্মীদেরকে কাজে যথাযথ অনুপ্রেরণা প্রদান ও তার সাথে তাদেরকে বিভিন্ন কল্যাণমূলক সাহায্য (যেমন স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা) প্রদান।

9. **শিল্প সম্পর্ক** (Industrial relations) : মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ হল কর্মীদের সাথে প্রতিষ্ঠানের সুসম্পর্ক গড়ে তোলা, যাতে সুস্থ শিল্পসম্পর্ক তৈরি হয় ও প্রতিষ্ঠানের সঠিক উন্নয়ন সম্ভব হয়।

৫.৭ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি (Functions of Human Resource Management)

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার কার্যাবলিকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় এবং সেগুলো হল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজ, ব্যবহারিক কাজ ও পরামর্শ প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

A. ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি (Managerial functions)

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ হল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি যা নীচে আলোচিত হল :

(i) **মানবসম্পদ পরিকল্পনা** (Human Resource Planning) : প্রতিষ্ঠানের কোন্ কোন্ বিভাগে কতজন ও কী জাতীয় গুণসমৃদ্ধ কর্মী প্রয়োজন সেই সম্পর্কে পূর্বানুমান করাকে মানবসম্পদ পরিকল্পনা বলে। মানবসম্পদ পরিকল্পনা সংগঠনের লক্ষ্য পূরণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে স্বীকৃত।

(ii) **সংগঠিতকরণ** (Organising) : সংগঠনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করার জন্য কর্মীদের মধ্যে যোগ্যতা অনুযায়ী যেমন কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়, তেমনি তাদের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তোলা হল সংগঠিতকরণ। এই বিশেষ কাজের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নতি সম্ভব হয়। এই কাজ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।

(iii) **নির্দেশদান** (Directing) : ধারাবাহিক সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং সেগুলি সাধারণ বা নির্দিষ্ট আদেশের মাধ্যমে বিভিন্ন পক্ষকে জানানো ও তাদের নেতৃত্ব দেওয়া হল নির্দেশদান, যা মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার একটি কাজ।

(iv) **নিয়ন্ত্রণ করা** (Controlling) : কাজের সন্তোষজনক সম্পাদন বা অগ্রগতি সুনিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পনা বা মান অনুযায়ী তা হচ্ছে কিনা পরীক্ষা করা এবং এই অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করার প্রক্রিয়াই হল নিয়ন্ত্রণ। যদি দেখা যায় পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবে কাজ সঠিক হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণমূলক যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ।

B. ব্যবহারিক কার্যাবলি (Operative functions)

(i) কর্মীসংগ্রহ এবং নির্বাচন (Recruitment and Selection) : মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ হল সংগঠনের জন্য কর্মী নির্বাচন করা। এই নির্বাচনের আগে কর্মী সংগ্রহের কাজটি পড়ে। কর্মী সংগ্রহ করে তাদের মধ্যে থেকে যোগ্য কর্মীকে নির্বাচন করা মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে পড়ে।

(ii) কাজের বিশ্লেষণ (Job Analysis) : কর্মী নির্বাচনের আগে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ হল কাজের প্রকৃতি নির্ধারণ করা এবং ওই জাতীয় কাজের জন্য কর্মীদের কী জাতীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, সে-সম্পর্কে ধারণা করা এবং তার বাস্তব প্রয়োগ করা।

(iii) কার্যসম্পাদন পর্যালোচনা (Performance Appraisal) : মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের কাজ হল যে সকল ব্যক্তি কর্মে নিয়োজিত আছেন তারা যথাযথভাবে তাদের কাজ করছেন কিনা সে-সম্পর্কে পর্যালোচনা করা। এর মাধ্যমে কর্মীদের কাজের প্রতি দৃষ্টি রাখা সম্ভব হয়।

(iv) কর্মী প্রশিক্ষণ (Training) : কর্মীরা যাতে সঠিকভাবে কাজের প্রতি তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে, সেজন্য সংগঠনের তরফে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া আবশ্যিক। এই প্রশিক্ষণ শুধুমাত্র যে নতুন কর্মীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে তা নয়, পুরানো যেসব কর্মী কাজ করেন তাদের কাজের মান উন্নয়নেও প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ এবং এই কাজ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত।

(v) পারিশ্রমিক সংক্রান্ত কার্যাবলি (Administration regarding remuneration) : মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে কর্মীদের পারিশ্রমিক প্রদান সম্পর্কে প্রশাসনিক কাজকর্ম পড়ে। কোন্ কর্মী কী জাতীয় কাজের জন্য কত পারিশ্রমিক পাবেন তা নির্ধারণ করা এই ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত।

(vi) কর্মীদের কল্যাণ (Employee welfare) : কর্মীদের কল্যাণসাধনের জন্য, তা সে আর্থিক হোক বা সামাজিক হোক, মানবসম্পদ বিভাগকে যথেষ্ট সক্রিয় থাকতে হয়। ফলে কর্মীরা কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে।

(vii) কর্মী ধরে রাখা (Retaining the employees) : কর্মীকে যে-কোনো সংগঠনে সম্পত্তি (Asset) হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার কাজ হল কর্মীদের যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করা এবং তাদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এইসব কল্যাণমূলক ব্যবস্থা যোগ্য কর্মীকে প্রতিষ্ঠানে ধরে রাখতে সাহায্য করে।

(viii) কর্মী সম্পর্ক (Employee relations) : কর্মীদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের অন্যতম মাধ্যম হল শ্রমিক ইউনিয়ন (Trade Union)। শ্রমিক ইউনিয়নের মাধ্যমে কর্মীরা তাদের দাবিদাওয়া মালিক পক্ষের কাছ থেকে আদায় করেন। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার কাজ হল শ্রমিকদের দাবিদাওয়া মেটানোর ক্ষেত্রে এমন ভূমিকা পালন করা যার ফলে কর্মীদের যেমন কাজের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়, তেমনি প্রতিষ্ঠানও উপকৃত হয়।

(ix) কর্মীদের তথ্য সংরক্ষণ (Employee records) : কর্মীদের তথ্য সংরক্ষণ অর্থাৎ কর্মীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাজে যোগদানের তারিখ, কোন্ পদে কর্মী যোগদান করেছে, তাদের আর্থিক সুবিধা কী দেওয়া হয়েছে, অন্যান্য কল্যাণমূলক সুযোগ-সুবিধা তারা কী পাচ্ছে ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্যকে বোঝায়। এই সকল তথ্যাদি সংরক্ষণ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ।

C. পরামর্শ প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি (Advisory functions)

(i) উচ্চ ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের পরামর্শ প্রদান (Advice to top management) : মানবসম্পদ ব্যবস্থাপকের অন্যতম কাজ হল উচ্চ ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত যে সকল ব্যক্তি আছেন তাদেরকে কর্মী সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান, যার ফলে সংগঠন ঠিকমতো চলতে পারে।

(ii) বিভাগীয় প্রধানদের পরামর্শ প্রদান (Advice to departmental heads) : মানবসম্পদ ব্যবস্থাপকের কাজ হল বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানকে মানবসম্পদ সম্পর্কিত, যেমন মানবসম্পদ পরিকল্পনা, কাজের বিশ্লেষণ, কর্মী নিয়োগ, কর্মী নির্বাচন, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা।

৫.৮ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব (Importance of Human Resource Management)

কিছু নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। উদ্দেশ্য তখনই সফল হয় যখন সংগঠনের মানব উপাদান এবং মানব বর্জিত উপাদানগুলির (Human and non-human elements) যথার্থ ব্যবহার সম্ভব হয়। অতীতে ব্যবস্থাপনার সাথে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সংগঠনের মানব বর্জিত উপাদানগুলির উপরই মূলত প্রাধান্য দিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে মানব উপাদানের উপর গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে কাঁচামাল হয়তো কম দামে ক্রয় করা সম্ভব, যন্ত্রপাতিও উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা সম্ভব, কিন্তু উৎপাদন তখনই বৃদ্ধি পায় যখন শ্রমিক বা কর্মী কাজে উৎসাহ পায় এবং তারা তাদের চূড়ান্ত দক্ষতা সংগঠনের কাজে লাগায়।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে সংগঠনের গতিশীলতা নির্ভর করে মনুষ্য সম্পদের কাম্য ব্যবহারের উপর, যা মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই একমাত্র সম্ভব। সুতরাং মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অসীম। নীচে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব আলোচনা করা হল :

● **মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব :**

1. মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ফলে মানবসম্পদের কাম্য ব্যবহার সম্ভব হয়।
2. এই ব্যবস্থাপনা সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে বেগবর্ধক শক্তি হিসাবে কাজ করে যার ফলে প্রতিষ্ঠান সচল থাকে ও তার কর্মপ্রবাহ বজায় রাখতে পারে।
3. এই ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সব ক্ষেত্রে, যেমন—উৎপাদন, আর্থিক, বিপণন ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই আবশ্যক। তাই এর পরিধি ব্যাপক।
4. এই ব্যবস্থাপনার সাহায্যে শ্রমিক সংগ্রহ, নির্বাচন, নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, মজুরি প্রদান, সুষ্ঠু পরিবেশ, নিয়মশৃঙ্খলা ইত্যাদি বজায় রাখা সম্ভব হয়।
5. এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিল্পে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মেনে চলা সম্ভব হয় যার ফলে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত সমস্ত কর্মী যথাযোগ্য মর্যাদা পায়।
6. এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কর্মীদের কল্যাণমূলক কার্যকলাপ গ্রহণ করা ও সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়, ফলে কর্মীদের আনুগত্য ও মনোবল বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।
7. এই ব্যবস্থাপনার সাহায্যে কর্মীদের দক্ষতা ও যোগ্যতাকে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করা সম্ভব হয়।
8. এই ব্যবস্থাপনার সাহায্যে কর্মীদের পরিচালন সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ সম্ভব হয়।
9. কর্মী ও মালিকদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ও বিশ্বাসবোধ জাগ্রত করে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা শ্রমিক মালিক সম্পর্ককে উন্নতির পর্যায়ে নিয়ে যায়।
10. কর্মীদের অনুপ্রাণিতকরণ ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে।
11. প্রতিষ্ঠানের দ্রব্যের ব্যয় হ্রাসে কর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদেরকে যত দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা যাবে, কাঁচামাল বা অন্যান্য ব্যয়ও দ্রত কম হবে। ফলে সামগ্রিকভাবে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে।
12. মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপনার স্নায়ুতন্ত্র। এর মাধ্যমে মানবসম্পদের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।
13. এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয়, অর্থসংস্থান ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত বিভিন্ন কর্মীদের কাজের মধ্যে সংযোজনা আসে।
14. মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সর্বজনীন। প্রতিষ্ঠানের সর্বক্ষেত্রে যেহেতু কর্মীদের প্রয়োজন অনস্বীকার্য, সেজন্য একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সর্বজনীন।

৫.৯ সারাংশ

মানবসম্পদ বলতে মানুষের বাহ্যিক আবরণকে বোঝায় না। মানুষের মধ্যে যে জ্ঞান, দক্ষতা, সৃজনশীল ক্ষমতা, প্রতিভা ইত্যাদি থাকে এবং এই সকল গুণাবলির সাহায্যে মানুষ যে কর্মযজ্ঞে সামিল হয় ও সংগঠনের উন্নতিকল্পে নিজেদের নিয়োজিত করে সামগ্রিকভাবে তাই হল মানবিক সম্পদ। এই মানবিক সম্পদকে যে কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে সুযোগ্য ও শক্তিশালী কর্মী গঠন করতে পারে যা সংগঠনের সার্বিক উন্নয়নে সাহায্য করে, তা হল মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা। এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কর্মীকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজে নিয়োগ করা ও সেই কাজে তাকে দক্ষ করে তোলা সম্ভব হয়। এই ব্যবস্থাপনার পরিধির অন্তর্গত বিষয়গুলি হল মানবসম্পদ পরিকল্পনা, কাজের বিশ্লেষণ ইত্যাদি। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা এই একক থেকে জানতে পারা যাবে।

৫.১০ অনুশীলনী

ক) বহুপছন্দ ভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার অর্থ হল মনুষ্য সম্পদের _________ ব্যবহার।

ক) সর্বোত্তম   খ) সাধারণ

গ) ব্যবহারিক   ঘ) সর্বনিম্ন

২। "মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার অর্থ হল মানবিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার"—এটি কার উক্তি।

ক) পিটার ড্রাকার   খ) ডেল বেক

গ) গ্রাহাম   ঘ) বুচানন

৩। HRM মডেল কোন্ সংস্থার তৈরি?

ক) American Society for Training and Development

খ) Training and Development Society of India

গ) Ministry of Commerce, Government of India

ঘ) Training Organisation of Singapore

৪। মানবসম্পদের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের মধ্যে নিম্নলিখিত কোনটি অন্তর্ভুক্ত নয়?

ক) কাজের গুণগত সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি   খ) উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি

গ) পরিবর্তনকে দ্রুততার সাথে গ্রহণ   ঘ) প্রতিষ্ঠানের আর্থিক তারল্য বজায় রাখা

৫। যার সাহায্যে সমস্ত কর্মীকে তাদের সমস্যা দূর করার ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেওয়া নিশ্চিত করা যায় তাকে বলে—

ক) কর্মী সাহায্য খ) কর্মী সম্পর্ক

গ) কর্মী ক্ষতিপূরণ ঘ) কর্মী গবেষণা

খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

১। মানবিক সম্পদ কাকে বলে?

২। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা দিন।

৩। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি সম্পর্কে দুটি বিষয় উল্লেখ করুন।

৪। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার পরিধি সম্পর্কে দুটি বিষয় আলোচনা করুন।

৫। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার দুটি কার্যাবলী উল্লেখ করুন।

গ) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

১। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা দিন। এর প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা দিন।

২। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার পরিধি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী আলোচনা করুন।

৪। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্বগুলি কী কী?

৫। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা কাকে বলে? মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যগুলি কী কী আলোচনা করুন।

একক ৬ ❑ মানবসম্পদ পরিকল্পনা, কর্মী-সংগ্রহ এবং নির্বাচন (Human Resource Planning, Recruitment and Selection)

মানবসম্পদ পরিকল্পনা

গঠন

৬.১ উদ্দেশ্য

৬.২ প্রস্তাবনা

৬.৩ মানবসম্পদ পরিকল্পনার সংজ্ঞা

৬.৪ মানবসম্পদ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

৬.৫ মানবসম্পদ পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য

৬.৬ মানবসম্পদ পরিকল্পনার ধাপ

কর্মী সংগ্রহ এবং নির্বাচন

৬.৭ কর্মী-সংগ্রহের সংজ্ঞা

৬.৮ কর্মী-সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা

৬.৯ কর্মী-সংগ্রহের উৎসসমূহ

৬.১০ কর্মী নির্বাচন সংজ্ঞা

৬.১১ কর্মী নির্বাচনের নীতি

৬.১২ কর্মী নির্বাচনের ধাপ

৬.১৩ সারাংশ

৬.১৪ অনুশীলনী

৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি থেকে নিম্নলিখিত ধারণা পাওয়া যাবে—

- মানবসম্পদ পরিকল্পনার সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা
- মানবসম্পদ পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য ও ধাপসকল
- কর্মী-সংগ্রহের সংজ্ঞা
- কর্মী-সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা

- কর্মী-সংগ্রহের উৎসসমূহ
- কর্মী নির্বাচন সংজ্ঞা ও নীতি
- কর্মী নির্বাচনের ধাপসমূহ

৬.২ প্রস্তাবনা

ভবিষ্যতে সংগঠনে যোগ্য কর্মীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পূর্বানুমান করা এবং যেসব কর্মী সংগঠনে কর্মরত তাদেরকে আরও উপযুক্তভাবে ব্যবহার করার যে প্রক্রিয়া তাকে মানবসম্পদ পরিকল্পনা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মানবসম্পদ পরিকল্পনা সংগঠনের লক্ষ্যপূরণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে স্বীকৃত। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে মানবসম্পদ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ, কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন, প্রতিভাময় কর্মী সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে লক্ষ্য রাখে। এরই সূত্র ধরে যেসব বিষয় সম্পর্কে আলোচনা প্রাসঙ্গিক তা হল কর্মী সংগ্রহ ও তার উৎসসমূহ, কর্মী নির্বাচন, তার গুরুত্ব, নীতি ও ধাপসমূহ সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যিক। এই সমস্ত বিষয় এই একক আলোচনার মাধ্যমে ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে।

৬.৩ সংজ্ঞা (Definition)

ভবিষ্যতে সংগঠনে যোগ্য কর্মীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পূর্বানুমান করা এবং যেসব কর্মী সংগঠনে কর্মরত তাদেরকে আরও উপযুক্তভাবে ব্যবহার করার যে প্রক্রিয়া তাকে মানবসম্পদ পরিকল্পনা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সুতরাং মানবসম্পদ পরিকল্পনা হল এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান তার চাহিদামতো সঠিক গুণসম্পন্ন কর্মী নিয়োগ করতে যেমন পারে, তেমনি তাদের কাছ থেকে যথাযথ কাজ আদায়ে সমর্থ হয়।

মানবসম্পদ পরিকল্পনা তাই সংগঠনের লক্ষ্য-পূরণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে স্বীকৃত। মনুষ্য শক্তি পরিকল্পনাকে বর্তমানে মানবসম্পদ পরিকল্পনা (Human Resource Planning) বলে। মানবসম্পদ পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সংজ্ঞা নীচে দেওয়া হল :

- **ডেকেনজো** ও **রবিন্স** (Decenzo & Robbins)-এর মতে, ‘‘মানবসম্পদ পরিকল্পনা হল সংগঠনে ভবিষ্যতে সঠিক সংখ্যায় সঠিক ধরনের কর্মীর চাহিদা এবং যোগান নির্ধারণের একটি প্রক্রিয়া”। *(Human resource planning is the process of forecasting an organisation's future demand for and supply of, the right type of people in the right number.)*
- **গর্ডন ম্যাকবেথ** (Gordon McBeath)-এর মতে, ‘‘সমস্ত সূত্র থেকে সংগঠনে পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক ধরনের সঠিক কর্মী সরবরাহ করা হল মানবসম্পদ পরিকল্পনা”। *(Planning*

of human resource supplies to provide the organisation with the right types of people from all sources to meet the planned requirements.)

৬.৪ মানবসম্পদ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা (Need for Human Resource Planning)

নীচে মানবসম্পদ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হল :

1. **মানবসম্পদ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ** (Obtaining information for human resource planning) **:** প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন সময়ে কর্মীর প্রয়োজন হয়। কী জাতীয় কর্মী ও কতজন কর্মীর প্রয়োজন হবে সে-সম্বন্ধে সঠিক পূর্বানুমান না করতে পারলে প্রতিষ্ঠানের কাজ ব্যাহত হয়। সেজন্য বিভিন্ন বিভাগ থেকে উপরিউক্ত তথ্য সংগ্রহ করে মানবসম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়।

2. **প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য পূরণ** (Realisation of enterprise objective) **:** প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য পূরণে কর্মীরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়। কর্মীরা দক্ষ না হলে প্রতিষ্ঠানের কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে যে ধরনের কর্মীর প্রয়োজন হয় সেই পরিকল্পনা সঠিকভাবে গ্রহণ করতে না পারলে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যপূরণ ব্যাহত হয় এবং সেজন্য মানবসম্পদ পরিকল্পনা আবশ্যক।

3. **কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন** (Distribution of responsibilities among the employees) **:** কর্মীদের মধ্যে কাজের দায়িত্ব বণ্টনের মাধ্যমে কর্মীদের ব্যক্তিগত দক্ষতা যেমন বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সফল করাও সম্ভব হয়। এই দায়িত্ব বণ্টন মানবসম্পদ পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্ভব। সুতরাং কীভাবে এবং কোন্ জাতীয় কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করা হবে তা মানবসম্পদ পরিকল্পনার দ্বারা স্থির করা হয়।

4. **ব্যয় সংক্ষেপ** (Cost reduction) **:** কর্মী সংগ্রহ থেকে শুরু করে প্রশিক্ষণ ও দায়িত্ব বণ্টন সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। যদি সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে কর্মীর গুণগত ও পরিমাণগত মান নির্ধারণ করা সম্ভব হয় সেক্ষেত্রে সময় সংক্ষেপের সাথে সাথে ব্যয় সংক্ষেপও করা সম্ভব হয়। এজন্যও প্রতিষ্ঠানে মানবসম্পদ পরিকল্পনা গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়।

5. **ভবিষ্যৎ ব্যয় অনুমান** (Estimation of future cost) **:** কর্মীদের পারিশ্রমিক প্রদানের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ভবিষ্যতে কর্মীরা কত পারিশ্রমিক পাবে তার সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করা আবশ্যক। সঠিক মানবসম্পদ পরিকল্পনার মাধ্যমে কর্মী সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ ব্যয় অনুমান করা সম্ভব।

6. **দক্ষতা বৃদ্ধি** (Increase in efficiency) **:** নতুন কর্মীদের নতুন কারিগরি বিদ্যায় শিক্ষিত করা জরুরি। নতুন ধরনের উৎপাদন প্রক্রিয়া বা নতুন কলাকৌশল যদি কর্মীরা রপ্ত করতে না

পারে, সেক্ষেত্রে কর্মীরা দক্ষতা অর্জন করতে পারে না, ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না ও ব্যয়সংক্ষেপও ঘটে না। মানবসম্পদ পরিকল্পনা কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

7. **পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো** (Coping with the change) : বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা, প্রযুক্তির পরিবর্তন, সরকারি নিয়মনীতি ইত্যাদি এখন খুবই পরিচিত ঘটনা। মানবসম্পদ পরিকল্পনা এইসব পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তন করা প্রয়োজন। বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা হলে কোম্পানিতে কী জাতীয় কর্মী আবশ্যক, প্রযুক্তির পরিবর্তন হলে কর্মীদের কী জাতীয় গুণগত মান থাকা আবশ্যক, সরকার কর্মী সংক্রান্ত কী নীতি গ্রহণ করবেন ইত্যাদি বিষয় যেমন করে পরিবর্তিত হবে সেইসব পরিবর্তনের সাথে প্রতিষ্ঠান কীভাবে নিজেকে পরিবর্তিত করবে তাও মানবসম্পদ পরিকল্পনার মাধ্যমে করা সম্ভব।

8. **প্রতিভাময় কর্মী সৃষ্টি করতে পারে** (Creating talented personnel) : বর্তমান উন্নত প্রযুক্তির যুগে এমন কর্মী দরকার যার পেশাগত যোগ্যতা অত্যন্ত বেশি। মানবসম্পদ পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে যেমন যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী পাওয়া সম্ভব হয়, তেমনি তাদের মধ্যে প্রতিভার যাতে বিকাশ ঘটে সে-সম্পর্কে কার্যকরী পরিবেশ গড়ে তোলাও সম্ভব হয়।

9. **দুর্বল শ্রেণির জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা** (Protection of weaker section) : কর্মীদের কাজে নিয়োগ করা এবং পদোন্নতির প্রশ্নে বর্তমানে মানবসম্পদ পরিকল্পনা করতে হলে তফশিলি জাতি, শারীরিকভাবে অক্ষম এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির দিকে লক্ষ রাখতে হয়। এদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষণ করা মানবসম্পদ পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য।

10. **আন্তর্জাতিক কৌশল** (Internal Strategies) : আন্তর্জাতিক স্তরে কর্মী নিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে বিশ্বায়নের সাথে সাথে। সেজন্য কোনো সংগঠনের যদি বিদেশি লোক নেবার প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে সঠিক মানবসম্পদ পরিকল্পনার মাধ্যমে কী জাতীয় কর্মী নেবার প্রয়োজন হবে, তার পারিশ্রমিক কোন্ দেশের মুদ্রায় প্রদান করতে হবে, তার নির্বাচনের পদ্ধতি কেমন হবে ইত্যাদি নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

11. **ত্রুটি সংশোধন** (Rectification of error) : প্রতিষ্ঠানে কর্মীরা আবশ্যকীয় উপাদান হিসাবে স্বীকৃত। মানবসম্পদ পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে যদি কোনো সমস্যা থাকে তা প্রকাশ করা সম্ভব হয় ও সাংগঠনিক দুর্বলতা দূর করা যায়।

৬.৫ মানবসম্পদ পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ (Features/Characteristics of Human Resource Planning)

মানবসম্পদ পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ হল নিম্নরূপ :

(i) মানবসম্পদ পরিকল্পনা হল কলা এবং বিজ্ঞান (Human Resource Planning is an Art and Science) **:** মানবসম্পদ পরিকল্পনা হল কলা ও বিজ্ঞানের মিশ্রণ। মানবসম্পদের মধ্যে যে সকল উদ্ভাবনী শক্তি আছে তা অন্বেষণ করা হল কলা এবং তাদের এই গুণাবলি কীভাবে প্রতিষ্ঠানের কাজে লাগলে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নতি হবে তার যথাযথ প্রয়োগ হল বিজ্ঞান।

(ii) এর ব্যাপ্তি সর্বাত্মক (It is Pervasive) **:** মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের সর্বক্ষেত্রে সব বিভাগে কাজে লাগে। এই ব্যবস্থাপনাকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজন মানবসম্পদের সঠিক পরিকল্পনা। মানবসম্পদ পরিকল্পনা সঠিকভাবে রচনা করলে প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব হবে।

(iii) প্রতিষ্ঠানের কর্মীর প্রয়োজন মেটানো এর লক্ষ্য (Focus for meeting demand) **:** প্রতিষ্ঠানে কতজন কর্মী প্রয়োজন এবং তাদের কী জাতীয় যোগ্যতা আবশ্যক তা মানবসম্পদ পরিকল্পনার অন্যতম বিচার্য বিষয়। অর্থাৎ কর্মীর চাহিদা ও কর্মীর যোগান সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানকে সঠিক চিত্র তুলে ধরা মানবসম্পদ পরিকল্পনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শুধু তাই নয়, কী জাতীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা প্রয়োজন তাও নির্ধারণ করা এই পরিকল্পনার মধ্যে পড়ে।

(iv) লক্ষ্য পূরণে সাহায্য করে (Helps to Achieve Goal) **:** মানবসম্পদ পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনার সাথে যুক্ত। কী জাতীয় মানবসম্পদ প্রয়োজন যা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য পূরণে সাহায্য করবে, সে-সম্পর্কে এই পরিকল্পনা খুবই প্রয়োজন। এটি একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক কাজে নিয়োগ করা যায় এবং যার ফলে প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ উদ্দেশ্য পূরণ সম্ভব হয়।

(v) ভবিষ্যৎ লক্ষ্য এর অভিমুখ (Future oriented) **:** পরিকল্পনা সবসময় ভবিষ্যতে কী হতে পারে সে-সম্পর্কে ধারণা দেয়। মানবসম্পদ পরিকল্পনা এমনভাবে রচনা করতে হয় যার ফলে প্রতিষ্ঠানের কত সংখ্যক কর্মী প্রয়োজন এবং তার সাথে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা কেমন দরকার সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কী ধরনের কর্মী দরকার সে-সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হল মানবসম্পদ পরিকল্পনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(vi) এই পরিকল্পনা প্রক্রিয়া সম্পর্কিত (Process oriented) **:** মানবসম্পদ পরিকল্পনার প্রতিটি কাজ একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া মেনে চলে। এই প্রক্রিয়া বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া মেনে চলে, যার ফলে ভবিষ্যতে কী ধরনের গুণাবলিসমৃদ্ধ কর্মী প্রয়োজন ও তাদের নির্বাচন কী পদ্ধতিতে হবে সে-সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব হবে। সুতরাং এই পরিকল্পনা একটি প্রক্রিয়া মেনে চলে।

(vii) এই পরিকল্পনা নির্দিষ্ট সময়ের উপর নির্ভরশীল (HR Planning having time frame) **:** মানবসম্পদ পরিকল্পনা স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি উভয় সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি করতে হয়।

সুতরাং সময় এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মীদের প্রয়োজন। এখন তাদেরকে স্বল্প সময়ের জন্য নিয়োগ করতে হবে, নাকি দীর্ঘ সময়ের জন্য নিয়োগ করতে হবে তা নির্ধারণ করা মানবসম্পদ পরিকল্পনার অন্তর্গত বিষয়।

(viii) কোম্পানির পরিকল্পনার সাথে এর সংযুক্তিকরণ (Linking with corporate planning) **:** মানবসম্পদ পরিকল্পনা কোম্পানির প্রধান পরিকল্পনার একটি অংশ। এই পরিকল্পনা উচ্চতর ব্যবস্থাপকগণকে প্রতিষ্ঠানের কর্মী সংখ্যা, তার নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করে ও তার বাস্তবায়নে সাহায্য করে।

(ix) চলমান প্রক্রিয়া (Continuous Process) **:** প্রতিষ্ঠান যতদিন থাকবে মানবসম্পদের প্রয়োজনীয়তাও ততদিন থাকবে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে মানবসম্পদ পরিকল্পনাও দীর্ঘস্থায়ী। কারবারের পরিবেশ পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তিত পরিবেশে মানবসম্পদের প্রয়োজনীয়তারও তারতম্য ঘটে। বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মীরও প্রয়োজন হয়। এসব বিষয়গুলিকে সামাল দেওয়ার জন্য মানবসম্পদ পরিকল্পনাও অবিরত করতে হয়। সেজন্য এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া।

৬.৬ মানবসম্পদ পরিকল্পনার ধাপ (Steps in Human Resource Planning)

ভবিষ্যতে মনুষ্যশক্তির পরিমাণ কত হবে সে-সম্পর্কে বর্তমানে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়াকে মানবসম্পদ পরিকল্পনা বলে। বড়ো বড়ো কারবারি সংস্থার ক্ষেত্রে যেখানে মানবসম্পদ বিভাগ (Human Resource) থাকে, সেখানে এই বিভাগ মানবসম্পদ পরিকল্পনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সাধারণভাবে নিয়মনীতি মেনে মানবসম্পদ পরিকল্পনা করতে যে তিনটি ধাপ অনুসরণ করতে হয় নীচে সেই ধাপগুলি রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল :

1. **সময়ের ভিত্তিতে পূর্বানুমান** (Period of forecasting) **:** মানবসম্পদ পরিকল্পনার প্রথম

ধাপ হল প্রতিষ্ঠানকে প্রথমে ঠিক করে নিতে হবে ভবিষ্যতে কোন্ কোন্ সময়ের জন্য কর্মী প্রয়োজন। যেমন প্রথম বছর, দ্বিতীয় বছর, তৃতীয় বছর, চতুর্থ বছর ইত্যাদি বছরের শেষে নির্ধারণ করতে হবে।

2. **কর্মীদের সংখ্যার ভিত্তিতে পূর্বানুমান** (Forecasting on the basis of number of employees) **:** প্রথমে কর্মী সংখ্যা নির্ধারণ করার পর সেখানে কত কর্মী মারা গেছেন, কতজন অবসর নিয়েছেন, কতজন চাকরি ছেড়ে গেছেন এবং কতজনকে ছাঁটাই করা হয়েছে সেই সংখ্যাকে বিয়োগ করতে হবে। বিয়োগ করার পর যে সংখ্যা পড়ে থাকে, সেই সংখ্যাই হল প্রতিষ্ঠানের কার্যকর কর্মী সংখ্যা।

3. **কর্মী প্রয়োজনের ভিত্তিতে পূর্বানুমান** (Forecasting depending on the necessity of employees) **:** দ্বিতীয় পদক্ষেপ অনুসরণ করার পর যে পরিমাণ কর্মী-সংখ্যা নির্ধারিত হবে, সেখান থেকে ঠিক করা হবে কর্মী-সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম আছে না বেশি আছে। যদি কম পরিমাণ কর্মী থাকে সেক্ষেত্রে নতুনভাবে কর্মী নির্বাচন বা পদোন্নতির মাধ্যমে উপযুক্ত সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করতে হবে। যদি অতিরিক্ত কর্মী পূর্বানুমান করা সম্ভব হয়, সেক্ষেত্রে ঠিক করতে হবে কীভাবে অতিরিক্ত কর্মী অন্যান্য কাজে বহাল করা যায় বা তাদের অবসর গ্রহণ করানো যায় ইত্যাদি।

৬.৭ কর্মী-সংগ্রহ (Recruitment)

সংজ্ঞা (Definition) **:** বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কারবারি জগৎ চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। তাই প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ও টিঁকে থাকা, প্রতিষ্ঠানের মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতির কথা মাথায় রেখে প্রতিভা অন্বেষণ এবং তার অধিগ্রহণ (Talent Search and acquisition) অত্যন্ত জরুরি। সঠিক কর্মী সংগ্রহের মাধ্যমে এই সংকটের মোকাবিলা করা সম্ভব। আর কর্মী সংগ্রহ হল কৌশলগত এমন এক কর্ম-প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে উপযুক্ত কর্মী সংগ্রহ করা সম্ভব।

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ হল উন্নততর উৎপাদন ব্যবস্থাকে মাথায় রেখে কর্মী সংগ্রহের ও নিয়োগের পরিকল্পনা করা। তবে এ কথা মনে রাখা দরকার যে সংগঠনে কতজন ও কী জাতীয় কর্মীর প্রয়োজন সে সম্বন্ধে পরিকল্পনা গ্রহণ করার পর কর্মী সংগ্রহের কাজ আরম্ভ হয়।

কর্মী-সংগ্রহ এমন এক পদ্ধতি যার মাধ্যমে উপযুক্ত কর্মী কোথা থেকে পাওয়া যাবে সেই উৎস নির্দিষ্ট করা হয় এবং কাজের জন্য তাদের আবেদন করতে উৎসাহিত করা হয়।

কর্মী-সংগ্রহ সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখক তাঁদের যেসব মতামত দিয়েছেন সেগুলি নীচে তুলে ধরা হল—

- **এডউইন ফ্লিপো** (Edwin B. Filippo)-এর মতে, ‘‘সম্ভাব্য কর্মপ্রার্থীর জন্য অনুসন্ধান ও তাদেরকে চাকুরির জন্য আবেদন করতে উৎসাহিত করার প্রক্রিয়াকে কর্মী সংগ্রহ বলে।” *("Recruitment is the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organisation.")*
- **টিনা এগ্রেল** (Tina Agrell) এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ‘‘কর্মী-সংগ্রহ হল জনসাধারণকে চাকুরির সুযোগ এমনভাবে জানানো যাতে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন যথেষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি আবেদন করতে পারে।”
- **ডেকেনজো ও রবিন্সের** (DeCenzo & Robbins) মতে, ‘‘সংগঠনের বর্তমান অথবা ভবিষ্যতের কাজের পদগুলি পূরণের জন্য উপযুক্ত আবেদনকারী আবিষ্কার করা হল কর্মী সংগ্রহ।” ("Recruitment is the discovering of potential applicants for actual or anticipated organisational vacancies.")

৬.৮ কর্মী-সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা (Need for Recruitment)

বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে কর্মী সংগ্রহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নীচে বর্তমান সময়ের নিরিখে কর্মী সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা আলোচিত হল :

(i) **কারবারের বৃদ্ধি** (Business Growth) : যে-কোনো কোম্পানির অন্যতম লক্ষ্য হল তার সামগ্রিক বৃদ্ধি। এই বৃদ্ধিকে সফলতার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন দক্ষ কর্মী। সেদিকে লক্ষ্য রেখে কর্মী সংগ্রহ করা হল বর্তমান কোম্পানিরগুলির গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

(ii) **কর্মীরা কাজ ছেড়ে দিলে তার জায়গায় সঠিক কর্মী নিয়োগ** (Replacing Departed Employees) : প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বর্তমানে কর্মীরা আরও উন্নতির লক্ষ্যে এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে। ফলে কর্মী সংখ্যা যে প্রতিষ্ঠানে কমে যায় সেখানে যোগ্য কর্মী নিয়োগ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে প্রতিষ্ঠানের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সেজন্য যথাযথ কর্মী সংগ্রহ অত্যন্ত জরুরি।

(iii) **দক্ষতার ফাঁক** (Skill Gap) : কোম্পানি সবসময় চায় প্রাসঙ্গিক নতুন দক্ষতা-সম্পন্ন কর্মী। এই শূন্যস্থান পূরণ একমাত্র সম্ভব যথাযথ কর্মী সংগ্রহের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

(iv) **বৈচিত্র্য এবং অন্তর্ভুক্তি** (Diversity and Inclusion) : বর্তমানে কর্মীদের মধ্যে বৈচিত্র্য এবং অন্তর্ভুক্তি খুই প্রয়োজনীয় বিষয়। কার্যকরী কর্মী সংগ্রহ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বহু বৈচিত্র্যময় এবং তাদের সঠিক কর্মে অন্তর্ভুক্তিকরণ সম্ভব হয়।

(v) **পরিবর্তন করার জন্য অভিযোজন ক্ষমতা** (Adaptability to change) : পৃথিবী দ্রুত

পরিবর্তনশীল এবং এই পরিবর্তনশীল জগতে কারবারের প্রয়োজন সেইসব কর্মী যারা পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজেদের যোগ্যতা বজায় রাখতে পারবে। কার্যকরী কর্মী সংগ্রহ প্রক্রিয়াই একমাত্র মাধ্যম যার সাহায্যে যোগ্য কর্মী এই পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে নিয়োগ করা সম্ভব হবে এবং যারা কোম্পানির উন্নতিকল্পে নিজেদের সম্পূর্ণ উজাড় করে দিতে পারবে।

(vi) **প্রযুক্তিগত অগ্রগতি** (Technological Advancement) : প্রযুক্তির ব্যাপক পরিবর্তন শিল্পের বর্তমান অবস্থাকে নতুন চেহারা দিয়েছে। যথাযথ কর্মী সংগ্রহ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে কর্মী নিয়োগ করা সম্ভব হবে।

(vii) **উদ্ভাবন এবং অভিযোজন** (Innovation and Adaptation) : প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কারবারের প্রয়োজন নতুন ধ্যান ধারণা। এই নতুন ধ্যান ধারণার সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য প্রয়োজন যোগ্য কর্মী। সেজন্য কার্যকরী কর্মী সংগ্রহ প্রক্রিয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

(viii) **ডিজিটাল রূপান্তর** (Digital Transformation) : বর্তমানে প্রতিটি কোম্পানিকে ডিজিটাল রূপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এই প্রক্রিয়া সাধারণ কর্মী দ্বারা সম্ভব নয়। যারা নিত্য নতুন প্রযুক্তির সাথে নিজেদের শিক্ষিত করে তোলে তারা কোম্পানির ডিজিটাল সংক্রান্ত সব কাজ—যেমন ডেটা অ্যানালিসিস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence), সাইবার সিকিউরিটি এবং ডিজিটাল বিপণন ইত্যাদি বিষয়ে অবহিত থাকে এবং কার্যকরী কর্মী সংগ্রহ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের নিয়োগ করা সম্ভব হয়।

(ix) **শ্রমশক্তির কর্মতৎপরতা** (Workforce Agility) : অপ্রত্যাশিত বাজার নির্ভর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অধিক কর্মতৎপরতা নির্ভর শ্রমশক্তির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত জরুরি। সঠিক কর্মী সংগ্রহ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্দিষ্ট দক্ষতা সম্পন্ন ও কর্মতৎপর শ্রমশক্তি কোম্পানি নিয়োগ করতে পারবে।

৬.৯ কর্মী-সংগ্রহের উৎস (Sources of Recruitment)

সাধারণত দুটি উৎস থেকে কর্মী সংগ্রহ করা হয় : (ক) অভ্যন্তরীণ ও (খ) বাহ্যিক। নীচের রেখাচিত্রে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উৎসগুলি দেখানো হল :

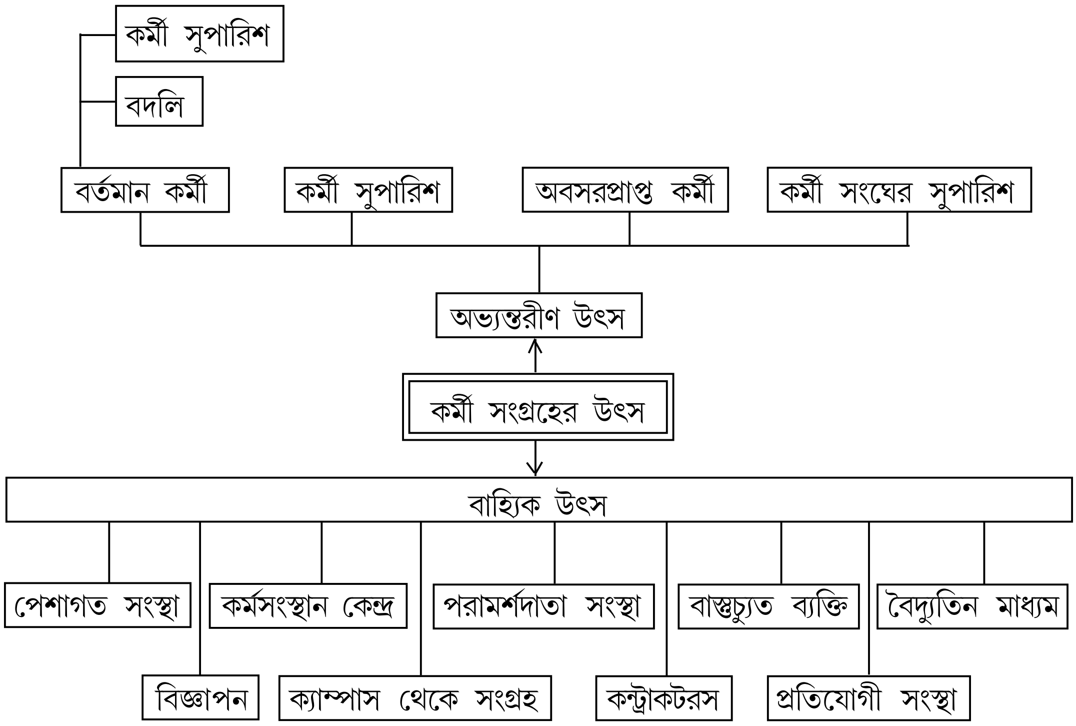

(ক) অভ্যন্তরীণ উৎস (Internal Sources)

কর্মী সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান সাধারণত প্রথমে যে উৎসের সাহায্য নেয় তা হল অভ্যন্তরীণ উৎস। সাধারণ কর্মী ও ব্যবস্থাপনার কর্মী এই উভয় প্রকার কর্মীই অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সংগ্রহ করা যায়। সুতরাং অভ্যন্তরীণ উৎস হল কর্মী-সংগ্রহের সেই উৎস বা প্রতিষ্ঠানের বর্তমান কর্মী বা বর্তমান কর্মীদের আত্মীয়স্বজন, পরিচিত ও বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির মধ্য থেকে নিয়োগ করা হয়। তবে অভ্যন্তরীণ উৎস কতখানি কার্যকরী হবে তা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এগুলি হল :

1. ব্যবস্থাপনার নীতি (Management policy);
2. নিয়োগ সম্পর্কিত ব্যয় (Cost relating to recruitment);
3. কাজের মধ্যে বিশেষায়ণের প্রয়োজনীয়তা (Need for specialisation in the work) ইত্যাদি।

- **অভ্যন্তরীণ উৎসের পদ্ধতি** (Methods of Internal Sources) **:**

প্রতিষ্ঠান কর্মী সংগ্রহের জন্য যেসব অভ্যন্তরীণ পদ্ধতি গ্রহণ করে সেগুলি হল নিম্নরূপ :

1. **বর্তমান কর্মী** (Present Employees) : প্রতিষ্ঠানে যেসব কর্মী কর্মরত অবস্থায় আছেন তারা যেমন নিজের ক্ষেত্রে পারদর্শী হন, তেমনি অনেক সময় দেখা গেছে তাদেরকে অন্যস্থানে

বদলি করলেও প্রতিষ্ঠান অনেক বেশি লাভবান হয়। তাই বর্তমান কর্মীদের থেকে কর্মী সংগ্রহ গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ উৎস হিসাবে স্বীকৃত। মূলত দুটি পদ্ধতি মারফত বর্তমান কর্মী থেকে কর্মী সংগ্রহ করা হয়। সেগুলি হল :

(ক) **বদলি** (Transfer) **:** প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পদে যেসব কর্মী কাজ করে তাদের সব সময় একই জায়গায় কাজ করানো সম্ভব হয় না। তাই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন জায়গায় তাদেরকে বদলি করে। এভাবে বদলির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান কর্মীদের খালি পদ পূরণ করে।

(খ) **পদোন্নয়ন** (Promotion) **:** পদোন্নয়নের মাধ্যমে কর্মী সংগ্রহ অভ্যন্তরীণ উৎস হিসাবে বহুল প্রচলিত। পদোন্নয়ন হল এক পদ থেকে উচ্চ পদে আসীন হওয়া। প্রতিষ্ঠানে যখন কোনো পদ খালি হয়, তা নীচের পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির পদোন্নয়নের মাধ্যমে পূরণ করা একটি প্রচলিত রীতি।

2. **কর্মী সুপারিশ** (Employee Referrals) : এটি একটি কার্যকর মাধ্যম। কর্মীদের সুপারিশ অনুযায়ী যদি তাদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন প্রতিষ্ঠানে যোগদান করতে সক্ষম হয়, সেক্ষেত্রে সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি একটি পরিবারের মতো কাজ করে। ফলে কারও দোষত্রুটি, অভাব অভিযোগ ইত্যাদি জানা সম্ভব হয়। এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে কর্মী সংগ্রহ সংক্রান্ত ব্যয় যেমন সর্বনিম্ন হয়, তেমনি সময়ের অপচয়ও বন্ধ হয়। এককথায় প্রতিষ্ঠানে সার্বিকভাবে কাজের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়।

3. **অবসরপ্রাপ্ত কর্মী** (Retired employee) : পূর্বতন কর্মী হিসাবে অনেকসময় অবসরপ্রাপ্ত কর্মীকে প্রতিষ্ঠানে পুনর্নিয়োগ করা হয়। আবার এও দেখা যায়, কোনো কর্মী প্রতিষ্ঠান ছেড়ে চলে গেছে। তারা আবার ফিরে আসতে চায়। এই পদ্ধতির একটি সুবিধা হল পুরানো কর্মীর কাজের ধারা সম্পর্কে প্রতিষ্ঠান পূর্বপরিচিত থাকে, যা প্রতিষ্ঠানকে কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করতে পারে।

4. **শ্রমিক সংঘের সুপারিশ** (Trade Union Referrals) : শ্রমিক সংঘ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেক সময় দেখা যায় যে কর্মী সংগ্রহের সময় প্রতিষ্ঠান শ্রমিক সংঘের সুপারিশ অগ্রাহ্য করে কর্মী নিয়োগ করতে পারে না কারণ তাহলে শিল্প-সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে তাদের সুপারিশকৃত ব্যক্তিদেরই নিয়োগ করতে প্রতিষ্ঠান বাধ্য হয়। তাই শ্রমিক সংঘের সুপারিশ অনুসারে কর্মী সংগ্রহও অভ্যন্তরীণ উৎসের একটি উদাহরণ।

(খ) বাহ্যিক উৎস (External Sources)

অভ্যন্তরীণ উৎস যেমন একটি কার্যকরী কর্মী সংগ্রহের মাধ্যম, তেমনি বাহ্যিক উৎস হল একটি বহুল প্রচলিত মাধ্যম। অভ্যন্তরীণ উৎস যেখানে কার্যকরী হয় না সেখানে বাহ্যিক উৎস গ্রহণ করতেই

হয়। তবে অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যারা বাহ্যিক উৎস ছাড়া কর্মী নিয়োগ করেই না। সাধারণভাবে বাহ্যিক উৎসগুলি কী কী তা নীচে আলোচিত হল :

1. **পেশাগত সংস্থা** (Professional Association) : পেশাগত যেসব সংস্থা আছে যেমন কস্ট ইন্‌স্টিটিউট, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ইন্‌স্টিটিউট, বিভিন্ন ম্যানেজমেন্ট ও ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্‌স্টিটিউট ইত্যাদি, তারা তাদের সদস্যদের কর্মসংস্থানের জন্য নির্দিষ্ট শাখা খোলেন। কোনো প্রতিষ্ঠান যদি মনে করে যে তাদের সংস্থার জন্য উপযুক্ত ডিগ্রিধারী কর্মী নিয়োগ করবে, সেক্ষেত্রে প্রয়োজনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সেইসব পেশাগত সংস্থা থেকে সদস্যদের তালিকা সংগ্রহ করে কর্মী নির্বাচন করতে পারে।

2. **বিজ্ঞাপন** (Advertisement) : বিজ্ঞাপন সবচেয়ে কার্যকরী বাহ্যিক উৎস হিসাবে স্বীকৃত। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, ব্যবসায়িক জার্নালে, টিভি, রেডিও ইত্যাদি মাধ্যমে কর্মখালির বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। এই বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়ে হতে পারে, নাম না দিয়ে পোস্ট বক্স নম্বরের মাধ্যমেও হতে পারে। বর্তমানে চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান কর্মখালির বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে, যা নান্দনিক পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে।

3. **কর্মস্থান কেন্দ্র** (Employment Exchange) : কর্মী সংগ্রহের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান কেন্দ্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষে 1959 সালের কর্মসংস্থান কেন্দ্র আইন অনুযায়ী যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে 25 জন বা তার থেকে বেশি সংখ্যক কর্মী কাজ করে, সেসব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নতুন কর্মী নিয়োগের সময় কর্মসংস্থান কেন্দ্রের সাহায্য নিতে হয়। কর্মসংস্থান কেন্দ্রে বিভিন্ন শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে যুবক-যুবতিরা নাম নথিভুক্ত করায়। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের ভিত্তিতে কর্মসংস্থান কেন্দ্র উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির নাম প্রতিষ্ঠানে পাঠায় এবং প্রতিষ্ঠান সেইমতো কর্মী নিয়োগ করে।

4. **ক্যাম্পাস থেকে কর্মী সংগ্রহ** (Campus Recruitment) : কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা সংস্থা ইত্যাদি থেকে সরাসরি প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের কর্মী সংগ্রহ করে থাকে। এইসব কর্মী সংগ্রহ করাকে ক্যাম্পাস রিক্রুটমেন্ট বলে। ভারতবর্ষে ইন্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট, ইন্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অফ টেকনলজি এই দুটি প্রতিষ্ঠান ক্যাম্পাসের চাকুরিস্থল হিসাবে অগ্রগণ্য। এই দুটি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও আরও কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেখান থেকেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্মী সংগ্রহ করে থাকে। বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে বহু আন্তর্জাতিক সংস্থা আছে যেমন হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, সিটি ব্যাঙ্ক, মটোরোলা, রিলায়েন্স ইত্যাদি তারা ক্যাম্পাসের মাধ্যমে যোগ্য কর্মী সংগ্রহ করে থাকে।

5. **পরামর্শদাতা সংস্থা** (Consultants) : এমন প্রতিষ্ঠান আছে যারা সরাসরি কর্মী সংগ্রহ না করে পরামর্শদাতা সংস্থার মাধ্যমে কর্মী সংগ্রহ করে। প্রতিষ্ঠান এইসব সংস্থাকে জানায় তাদের

কী জাতীয় কর্মীর প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের ভিত্তিতে এইসব সংস্থা নিজেরাই বিজ্ঞাপন ও ইন্টারভিউ নিয়ে যোগ্য কর্মী বাছাই করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করে। এই কাজের জন্য তারা নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক পায়। ভারতবর্ষে Sutra HR, ABC Consultants, Adecco India, AON Hewitt, Career Net, Global Innov Source, IKYA Human Capital ইত্যাদি সংস্থা এই জাতীয় পরামর্শদাতা সংস্থা হিসাবে পরিচিত।

6. **কন্ট্রাকটরস্** (Contractors) : অনেক সময় প্রতিষ্ঠানে অনিয়মিত কর্মীর (Casual labour) প্রয়োজন হয়। এই অনিয়মিত কর্মী সরবরাহ করার জন্য কিছু কিছু কন্ট্রাকটর থাকেন। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হলে কন্ট্রাকটর সেই ধরনের কর্মী সরবরাহ করে থাকে। এইসব কর্মীর নাম অবশ্য কোম্পানির খাতায় থাকে না।

7. **বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি** (Displaced Persons) : কোনো কোম্পানি কোনো জায়গায় গড়ে উঠলে সেখানে বহু লোক বাস্তুচ্যুত হন। তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা কোম্পানির সামাজিক দায়িত্ব। এইসব ব্যক্তিরা আবার প্রবেশনের উৎস হিসাবে কাজ করে। সংশ্লিষ্ট কোম্পানি তার সামাজিক দায়িত্ব মেটানোর জন্য সেইসব বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে কর্মী নিয়োগ করে।

8. **আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কর্মী সংগ্রহ** (International Recruiting) : বিশ্বায়নের যুগে বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কর্মী সংগ্রহ করে থাকে। বিভিন্ন এমব্যাসির (Embassy) মাধ্যমে এই কর্মী সংগ্রহ করা হয়। আবার ইন্টারনেটের মাধ্যমে উৎসাহী ব্যক্তির জীবনপঞ্জি দেখে টেলিফোনে কথোপকথনের মাধ্যমেও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কর্মী সংগ্রহ করতে দেখা যায়। এই ধরনের কর্মী সংগ্রহের মাধ্যম বর্তমানে খুবই প্রচলিত।

9. **প্রতিযোগী সংস্থা** (Competitors) : কোনো সংস্থা তার প্রতিযোগী অন্য সংস্থা থেকে কর্মীকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে নিজের সংস্থায় নিয়োজিত করে। এটি এক ধরনে কর্মী সংগ্রহের বাহ্যিক উৎস যাকে প্রচলিত অর্থে পোচিং (Poaching—অন্যায়ভাবে অনুপ্রবেশ করা) বা রেডিং (Raiding—হানা দেওয়া) বলে।

10. **বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাহায্যে কর্মী সংগ্রহ** (*E*-Recruiting) : বর্তমানে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের দ্বারা কর্মী সংগ্রহ খুবই প্রচলিত বাহ্যিক উৎস হিসাবে বিবেচিত হয়। আজকাল বিভিন্ন কোম্পানি তার ওয়েবসাইটে (Website) চাকরি সংক্রান্ত মেনুতে (Menu) সংশ্লিষ্ট কোম্পানিতে কোন্ পদে কত কর্মী নেওয়া হবে এবং তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি প্রয়োজন সেইসব তথ্য দেয়। সম্ভাব্য প্রার্থীরা উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে সেইসব কোম্পানিতে আবেদন করে। সুতরাং বৈদ্যুতিন মাধ্যম বর্তমানে খুবই প্রচলিত কর্মী সংগ্রহের একটি কার্যকরী মাধ্যম।

৬.১০ কর্মী-নির্বাচন (Selection of Employees)

সংজ্ঞা (Definition) : উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা কাজ সম্পাদন করা যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছেই কাম্য। এইসব ব্যক্তির দ্বারা কাজ সম্পন্ন হলে সংগঠনের উদ্দেশ্য সফল করা সহজ হয়। যদি কোনো কাজের জন্য সঠিক ব্যক্তি নির্বাচন করা না যায়, সেক্ষেত্রে সঠিকভাবে কাজ সম্পাদন অসম্ভব হয়ে পড়ে। সুতরাং বিভিন্ন পদে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী বেছে নেওয়াকে কর্মী নির্বাচন বলা হয়।

- কর্মী নির্বাচন সম্পর্কে **টিনা এ্যাগ্রল** (Tina Agrall) যা সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল : ‘‘যাদের নতুন কাজে সাফল্য অর্জন করার সম্ভাবনা আছে, আবেদনকারীদের মধ্যে থেকে সেসব প্রার্থীদের পছন্দ করাকে কর্মী নির্বাচন বলে।” *("Selection means choosing from that number, those applicants who are most likely to succeed in the new job.")*
- **টমাস স্টোনের** (Thomas Stone) মতে, ‘‘কর্মী নির্বাচন হল এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আবেদনকারীদের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হয় এবং যার ফলে যিনি কাজে সবচেয়ে সফল হবেন তাকে চিহ্নিত করা যায়।” *("Selection is the process of differentiating between application in order to identify those with a greater likelihoods of success in a job.")*
- **গ্যারী ডেসলার** (Garry Dessler)-এর মতে, ‘‘কর্মী নির্বাচন একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে আবেদনকারীদের মধ্যে থেকে সঠিক শিক্ষাগতযোগ্যতা সম্বলিত এবং যোগ্য কর্মী নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।” *("Selection is the process of picking individuals out of the pool of job applications, with requisite qualifications and competence to fill jobs in the organisations.")*

কর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় বিবেচনা করতে হয় :

(i) কী পদের জন্য কর্মী আবশ্যক; ও

(ii) সেই পদের জন্য কীরূপ যোগ্যতা প্রয়োজন।

যোগ্যতা বিচারের মাধ্যমেই কর্মী নির্বাচন করা হয়। এই যোগ্যতা বা গুণাবলিকে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করে নির্বাচন করা হয়, যেমন—

1. শিক্ষাগত ও কারিগরি যোগ্যতা;
2. বুদ্ধিমত্তা ও হাতের কৌশল;
3. স্বাস্থ্য ও শরীরের গঠন;
4. দায়িত্ব ও উদ্যোগ;

5. আদেশ দেওয়া ও আদেশ পালনের মানসিকতা;
6. ব্যক্তিত্ব; ও
7. কাজের পরিবেশকে মানিয়ে নিয়ে কাজ করার ক্ষমতা।

৬.১১ কর্মী-নির্বাচনের নীতি (Principles of Employee Selection)

কর্মীদের যোগ্যতা ও পদের মানের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে কর্মী নির্বাচন করা হল কর্মী-ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কর্মী-নির্বাচন যাতে যথাযথভাবে করা যায় সেজন্য কয়েকটি নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করতে হয়। নীচে এগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হল :

1. **প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি** (Nature of enterprise) : প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি অনুসারে কর্মী নির্বাচন করতে হয়। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যে ধরনের কর্মী আবশ্যক, সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সেই জাতীয় কর্মীর প্রয়োজন নেই। সুতরাং, কাজের চরিত্র অনুযায়ী কর্মী নির্বাচনের নীতি অনুসরণ করতে হয়।
2. **প্রতিষ্ঠানের আকৃতি** (Size of the enterprise) : একটি বড়ো প্রতিষ্ঠানের কর্মী নির্বাচনে যে নীতি অনুসরণ করা হয়, ছোটো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সেই নীতি অনুসরণ করা হয় না। তাই প্রতিষ্ঠানের আকৃতির উপরেও কর্মী নির্বাচনের নীতি নির্ভর করে।
3. **কর্মী সংগ্রহের ব্যয়** (Cost of employee selection) : কর্মী সংগ্রহের ব্যয় কর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কর্মী ব্যবস্থাপকের অন্যতম কাজ হল কম ব্যয়ে কর্মী সংগ্রহ করা। তাই কর্মী নির্বাচনে কর্মী সংগ্রহের ব্যয় একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হিসাবে স্বীকৃত।
4. **কাজের বিশ্লেষণ** (Analysis of job) : কর্মী নির্বাচনের সময় কাজের বিশ্লেষণ করা (অর্থাৎ কোন্ কাজ কর্মীকে সম্পাদন করতে হবে) কর্মী-ব্যবস্থাপকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কাজের বিশ্লেষণ না করলে সঠিক পদে সঠিক কর্মী নির্বাচন করা সম্ভব হয় না। তাই কাজের বিশ্লেষণ কর্মী-নির্বাচনের একটি অন্যতম নীতি হিসাবে গণ্য করা হয়।

৬.১২ কর্মী-নির্বাচনের ধাপ (Steps in selection)

কর্মীকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত করলে তার থেকে উপযুক্ত ফল আশা করা যায়। কর্মীর যোগ্যতা বিচার করা খুব সহজ নয়। সাধারণত মনস্তাত্ত্বিক কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে কর্মীর যোগ্যতা বিচার করা হয়। কর্মী নির্বাচনের পদ্ধতিগুলি হল :

1. **অধিযাচনপত্র** (Requisition) : প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মীপদ পূরণের জন্য মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগের সাহায্য নেওয়া হয়। এই বিভাগগুলি

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগে অধিযাচনপত্র প্রেরণ করে জানায় তাদের কত সংখ্যক কর্মী প্রয়োজন। এর উপর ভিত্তি করে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগ প্রয়োজনীয় কর্মী নির্বাচন করে।

2. **সম্ভাব্য উৎস সন্ধান ও বিজ্ঞাপন** (Selecting possible sources of recruitment and advertisement) : বিভিন্ন বিভাগ থেকে অধিযাচনপত্র পাবার পর মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগ কার্যকরী বিজ্ঞাপন-মাধ্যমের খোঁজ করে এবং তাতে কর্মীর জন্য বিজ্ঞাপন দেয়। বিজ্ঞাপন দেওয়ার ক্ষেত্রে খবরের কাগজ, বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকা, টিভি ইত্যাদি খুবই প্রচলিত মাধ্যম।

3. **আবেদনপত্র চাওয়া ও পরীক্ষা করা** (Asking for and screening the application form) : মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগ বিভিন্ন বিভাগের জন্য যোগ্য প্রার্থীর কাছ থেকে আবেদনপত্র চেয়ে পাঠায়। আবেদনপত্র পাওয়ার পর সেগুলি পরীক্ষা করা হয় ও অযোগ্য আবেদনপত্র বাতিল করা হয়। এরপর যেসব আবেদনপত্র যোগ্যতার মানে পৌঁছাতে পারে সেগুলির তালিকা প্রস্তুত করা হয়।

4. **অলিখিত আবেদনপত্র বা দরখাস্ত** (Application Blanks) : এই পদ্ধতিতে একটি তালিকা অনুযায়ী যোগ্য ব্যক্তিদের কাছে নমুনা দরখাস্তপত্র (Proforma) পাঠানো হয় এবং নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সেই দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগে পাঠাতে অনুরোধ করা হয়। এর ফলে আগের পাঠানো দরখাস্ত ও প্রপত্রে উল্লিখিত তথ্যাদির মধ্যে যদি কোনো গরমিল থাকে তা প্রকাশ পায়।

5. **কর্ম সম্পর্কিত পরীক্ষা** (Trade Test) : বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই কিছু কিছু কাজ রয়েছে যার জন্য বিশেষ কারিগরি শিক্ষা আবশ্যক, যেমন—স্টেনোগ্রাফি, টাইপিং, কম্পিউটার পরিচালনা ইত্যাদি। এসব কাজে বিশেষ কর্মনৈপুণ্য দরকার হয় বলে ব্যক্তির কর্মনৈপুণ্য সম্বন্ধে ধারণা করার জন্য কর্ম-সম্পর্কিত পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়।

6. **লিখিত পরীক্ষা** (Written Examination) : প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ একটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। সাধারণত কেরানি থেকে ব্যবস্থাপক পর্যন্ত কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা বিচার করতে লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়। এই পরীক্ষার মাধ্যমে কর্মীর সাধারণ জ্ঞান, বিচার-শক্তি, তথ্য পরিবেশন শক্তি, গণনা শক্তি ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব হয়।

7. **সাধারণ সাক্ষাৎকার** (Ordinary Interview) : লিখিত পরীক্ষায় সফল পরীক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা একটি প্রচলিত পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে প্রার্থীর সামগ্রিক চরিত্র, কাজ করার মানসিকতা ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। এই সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য প্রতিষ্ঠান

একটি কমিটি গঠন করে এবং সেই কমিটির উপর প্রার্থীকে বিভিন্ন প্রশ্ন করা ও তার গুণাগুণ বিচার করার ভার দেওয়া হয়।

8. **নিগূঢ় সাক্ষাৎকার** (In-depth Interview) : নিগূঢ় সাক্ষাৎকার সাধারণত বিশেষ ধরনের কর্মী অর্থাৎ ব্যবস্থাপক বা উচ্চপদস্থ কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে নেওয়া হয়। এই জাতীয় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রার্থীর সমস্ত প্রকার বিশেষত্ব যাচাই করা হয়। প্রার্থীকে এমন কিছু প্রশ্ন করা হয় যা তার সামগ্রিক বিশেষত্ব প্রকাশ করতে সাহায্য করে।

9. **মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা** (Psychological Test) : প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব মানসিক গঠন থাকে। প্রার্থীর মানসিক গঠন কেমন সে-সম্বন্ধে একটি ধারণা থাকা আবশ্যক। এই যুক্তিতে মনস্তত্ত্ববিদরা ব্যক্তির মনস্তত্ত্বগত কিছু পরীক্ষা করেন যার মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণ সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। এই পরীক্ষায় প্রার্থীকে কিছু কাজ দেওয়া হয় ও সেই কাজ পর্যালোচনা করে তার মূল্যায়ন করা হয়। এছাড়াও বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা (Intelligence Test), আগ্রহ পরীক্ষা (Interest Test), ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা (Personality Test) ইত্যাদির মাধ্যমেও কর্মী নির্বাচন করা হয়।

10. **অতীতের তদন্ত** (Past Investigation) : কর্মী-নির্বাচন পদ্ধতিতে অনেক সময় অতীত কাজের জায়গা থেকে সংশ্লিষ্ট কর্মী সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হয়। এই কাজের জন্য পুরানো নিয়োগকর্তার কাছ থেকে কর্মীর যোগ্যতা ও কাজকর্ম সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে তাকে নিয়োগ করা হয়। তবে পুরানো কর্মস্থল থেকে অনেক সময় যথার্থ খোঁজ পাওয়াও যায় না।

11. **ডাক্তারি পরীক্ষা** (Medical Test) : শুধু প্রার্থীর মানসিক গঠন সম্বন্ধে ধারণা নিয়ে তাকে নির্বাচন করা উচিত নয়। কারণ সুস্বাস্থ্য না থাকলে কর্মীর পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। সুতরাং, কর্মীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে করা হয় এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেই কর্মীকে নির্বাচন করা হয়।

12. **কর্মস্থলে পরীক্ষা ও নির্বাচন** (On-the-job Test and Selection) : বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে কর্মী নির্বাচন করার পর তাকে স্থায়ীভাবে কাজে নিয়োগ করা হয়। কর্মীকে স্থায়ীভাবে কাজে নিয়োগ করার আগে অনেকসময় তাকে কাজের জায়গায় পরীক্ষা করা হয়। ফলে মূল কাজ করার ক্ষেত্রে তার যোগ্যতা বিচার করা সম্ভব হয়। কর্মী যদি যোগ্যতার মান অতিক্রম করতে পারে, তাহলে তাকে নির্বাচন করা হয়।

13. **আবেশন** (Induction) : উপরিউক্ত বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রার্থী নির্বাচন করা হয় ও তাদের নিয়োগপত্র (appointment letter) প্রদান করা হয়। এরপর যে কাজের জন্য প্রার্থীকে নির্বাচন করা হয়েছে সেই কাজের সাথে তাকে পরিচয় করানো হয়। সংগঠনের অন্যান্য কর্মী, সাংগঠনিক কাঠামো, চাকুরির শর্তাবলি ইত্যাদি সম্পর্কে প্রার্থীকে জানানো হল আবেশন।

৬.১৩ সারাংশ

মানবসম্পদ পরিকল্পনা সংগঠনের লক্ষ্য-পূরণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে স্বীকৃত। এই পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপকগণ চেষ্টা করেন সঠিক সংখ্যক, সঠিক গুণমানসম্পন্ন ব্যক্তি, সঠিক স্থানে, সঠিক সময়ে নিয়োগ করা উচিত, যার ফলে সংগঠন ও ব্যক্তি উভয়েই তাদের দীর্ঘকালীন সুবিধা অর্জনে সফল হবে। মানবসম্পদ পরিকল্পনার মাধ্যমে মানবসম্পদ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ, কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন, পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো, প্রতিভাময় কর্মী সৃষ্টি, দুর্বল শ্রেণির জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পাদন করা সম্ভব হয়। সুতরাং প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য-এর অভিমুখ ঠিক করার জন্য যথাযথ মানবসম্পদ পরিকল্পনা আবশ্যিক। মানবসম্পদ পরিকল্পনা, কর্মী-সংগ্রহ ও নির্বাচন সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে এই একক থেকে ধারণা পাওয়া যাবে।

৬.১৪ অনুশীলনী

ক) বহুপছন্দ ভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। ________ পরিকল্পনা হল সংগঠনে ভবিষ্যতে সঠিক সংখ্যায় সঠিক ধরনের কর্মীর চাহিদা এবং যোগান নির্ধারণের একটি প্রক্রিয়া।

ক) কর্মী সংগ্রহ খ) কর্মী নির্বাচন

গ) কর্মী দক্ষতা ঘ) মানবসম্পদ

২। মানবসম্পদ পরিকল্পনার ধাপগুলির মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য নয়?

ক) সময়ের ভিত্তিতে পূর্বানুমান খ) কর্মীসংখ্যা ভিত্তিতে পূর্বানুমান

গ) কর্মী প্রশিক্ষণের পূর্বানুমান ঘ) কর্মী প্রয়োজনের ভিত্তিতে পূর্বানুমান

৩। সংগঠনের বর্তমান অথবা ভবিষ্যতের কাজের পদগুলি পূরণের জন্য উপযুক্ত আবেদনকারী আবিষ্কার করা হল __________ ।

ক) কর্মী সংগ্রহ খ) কর্মী নির্বাচন

গ) মানবসম্পদ পরিকল্পনা ঘ) কর্মী প্রশিক্ষণ

৪। কর্মী সংগ্রহের অভ্যন্তরীণ উৎসটি হল—

ক) কর্মী সুপারিশ খ) পরামর্শদাতা সংস্থা থেকে কর্মী সংগ্রহ

গ) বিজ্ঞাপন ঘ) ক্যাম্পাস থেকে সংগ্রহ

৫। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চাকরির আবেদনকারীদের মধ্যে সবচেয়ে সফল আবেদনকারী হিসাবে চিহ্নিত করা হয় তাকে বলে—

ক) কর্মী সংগ্রহ | খ) কর্মী নির্বাচন
গ) ক) ও খ) উভয়ই | ঘ) মানবসম্পদ পরিকল্পনা

খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

১। মানবসম্পদ পরিকল্পনার সংজ্ঞা দিন।

২। মানবসম্পদ পরিকল্পনার দুটি প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করুন।

৩। কর্মী সংগ্রহ কাকে বলে?

৪। কর্মী সংগ্রহের অভ্যন্তরীণ উৎসের দুটি উদাহরণ দিন।

৫। কর্মী নির্বাচন বলতে কী বোঝায়?

গ) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

১। মানবসম্পদ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

২। মানবসম্পদ পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী?

৩। কর্মী সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করুন।

৪। কর্মী সংগ্রহের উৎসসমূহ আলোচনা করুন।

৫। কর্মী নির্বাচনের ধাপসমূহ কী কী আলোচনা করুন।

একক ৭ ❑ প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়ন (Training and Development)

গঠন

৭.১ উদ্দেশ্য

৭.২ প্রস্তাবনা

৭.৩ প্রশিক্ষণের সংজ্ঞা

৭.৪ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

৭.৫ কর্মী প্রশিক্ষণের সুবিধা

৭.৬ কর্মী প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়া ও ধাপ

৭.৭ কর্মী প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

৭.৮ কর্মী উন্নয়ন

৭.৯ ব্যবস্থাপকদের উন্নয়নের পদ্ধতি

৭.১০ সারাংশ

৭.১১ অনুশীলনী

৭.১ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে—

- প্রশিক্ষণের সংজ্ঞা
- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য
- কর্মী প্রশিক্ষণের সুবিধা
- কর্মী প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়া ও ধাপ
- কর্মী প্রশিক্ষণ পদ্ধতি
- কর্মী উন্নয়ন
- ব্যবস্থাপকদের উন্নয়নের পদ্ধতি

৭.২ প্রস্তাবনা

কর্মপ্রবাহ সচল রাখার জন্য প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় কর্মী রাখা আবশ্যিক। সঠিক পরিমাণে সঠিক

কর্মী নিয়োগ করার জন্য প্রতিষ্ঠানকে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ হল উন্নততর উৎপাদন ব্যবস্থাকে মাথায় রেখে কর্মী সংগ্রহের ও নিয়োগের পরিকল্পনা করা। কিন্তু কর্মী সংগ্রহ ও নিয়োগের মাধ্যমেই মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার কাজ সীমাবদ্ধ নয়। কর্মীদের নির্দিষ্ট দক্ষতা, জ্ঞানের ক্ষেত্র বা ব্যবহারের ক্ষেত্রকে উন্নত করার জন্য কিছু প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয় যাকে প্রশিক্ষণ বলে। এই প্রশিক্ষণ না হলে কর্মীরা প্রতিষ্ঠানের কাজের সাথে নিজেদেরকে মেলাতে পারবেন না, ফলত প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক লক্ষ্য পূরণ সম্ভব হবে না। প্রশিক্ষণ যেমন কর্মীদের দক্ষ করে তোলে, তেমনি কর্মীদের ব্যক্তিগত উন্নতিও ঘটে। কর্মীদের প্রশিক্ষণের পদ্ধতি কেমন হবে, কর্মী উন্নয়নের পদ্ধতি কেমন ভাবে ঘটে ইত্যাদি বিষয় এই একক থেকে জানতে পারা যাবে।

৭.৩ প্রশিক্ষণ (Training)

সংজ্ঞা (Definition) : কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির কোনো নির্দিষ্ট দক্ষতা, জ্ঞানের ক্ষেত্র বা ব্যবহারের ক্ষেত্রকে উন্নত করার জন্য যে শিক্ষা, নির্দেশ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষিত করার যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয় তাকে প্রশিক্ষণ বলে।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে কর্মীদের কাজ করার সামর্থ্য ও কাজের প্রতি তাদের উৎসাহ এই বিষয়গুলির উপর সংগঠনের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। কর্মীদের কাজ করার ক্ষমতা নির্ভর করে তাদের কাজের মানসিকতা ও প্রশিক্ষণের উপর। একটি সূত্রের সাহায্যে বিষয়টি দেখানো হল :

কাজ করার ক্ষমতা = (মানসিকতা × প্রশিক্ষণ × অন্যান্য বিষয়)

উপরের সূত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে কর্মীর মানসিকতা, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য বিষয়ের উপর কর্মীদের কাজ করার ক্ষমতা নির্ভরশীল। এই সূত্রকে যদি বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে অন্যান্য বিষয় যেমন, কারখানার কাজের পরিবেশ, ব্যবস্থাপকদের সাথে কর্মীদের সম্পর্ক ইত্যাদি যদি অপরিবর্তিত থাকে, সেক্ষেত্রে মানসিকতা খারাপ হলে কাজ করার ক্ষমতা কমবে। আবার মানসিকতা ঠিক থাকলেও কর্মীরা যদি সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হয়, সেক্ষেত্রেও কাজ করার ক্ষমতা হ্রাস পাবে। এখন প্রশ্ন ওঠে : মানসিকতা বেশি জরুরি না প্রশিক্ষণ? বিভিন্ন চিন্তাবিদ বলেছেন যে বর্তমান বিশ্বায়নের (Globalisation) যুগে কর্মী-মানসিকতা ও কর্মী-প্রশিক্ষণ উভয়ই জরুরি। তবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী প্রতিষ্ঠানে যেমনভাবে গৃহীত হয়, প্রশিক্ষণ না পাওয়া কর্মী কাজ না করতে পারার জন্য ঠিক সেইভাবেই উপেক্ষিত হয়। সেজন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মী-সংস্থাপন করার পর তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কারণ আপাতদৃষ্টিতে কর্মীদের একইরকম মনে হলেও বাস্তবে তাদের কাজ করার ক্ষমতা ও মানসিকতা বিভিন্ন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। সুতরাং কোনো বিশেষ কাজ সম্পন্ন করার জন্য কর্মীদের যে জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন হয় তা যে পদ্ধতির মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয় তাকেই প্রশিক্ষণ বলে।

- **এডউইন বি. ফ্লিপোর** (Edwin B. Filippo) মতে প্রশিক্ষণ হল : "কোনো নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য কোনো কর্মীর জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকেই বলে প্রশিক্ষণ" *(The act of increasing the knowledge and skills of an employee for doing a particular job.)*।
- **ডিকানজো ও রবিন্স** (Decanzo and Robbins)-এর মতে, "প্রশিক্ষণ একটি জ্ঞান অর্জনের অভিজ্ঞতা, যার মাধ্যমে কর্মীদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন সূচিত হয় ও কর্মীরা, পুরুষ হোন বা মহিলা হোন, তাদের কাজের ক্ষমতা বাড়াতে সক্ষম হয়" *(Training is a learning experience in that it seeks a relatively permanent change in an individual that will improve his or her ability to the job.)*।

৭.৪ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য (Purpose of Training)

প্রতিষ্ঠানে কর্মী প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। এমন কোনো প্রতিষ্ঠান পাওয়া যাবে না যেখানে প্রশিক্ষণ ছাড়া কর্মীদের কাছ থেকে কার্যোদ্ধার সম্ভব। প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক লক্ষ্য হল এই প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা এবং দক্ষ সংগঠক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করা। সঠিক প্রশিক্ষণ এই উদ্দেশ্য পূরণে সাহায্য করে। নীচে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য আলোচনা করা হল :

1. **সংগঠনের সাথে পরিচিত করানো** (To introduce with the organisation) : কর্মী নির্বাচনের পর তাদের নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়। বিভাগীয় প্রধান নির্বাচিত কর্মীকে সংগঠনের বিভিন্ন স্তর ও সেই কর্মীর নির্ধারিত কাজ সম্বন্ধে অবহিত করান। ফলে কর্মী তার কাজ সম্বন্ধে একটি ধারণা পায় যা তাকে কাজ সম্পাদন করতে সাহায্য করে।
2. **উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি পায়** (Increased productivity) : একজন প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত কর্মী অন্য কর্মীদের থেকে দক্ষ হয়। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে দক্ষ কর্মী উৎপাদনের গুণগত মান ও পরিমাণ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। সুতরাং প্রশিক্ষণ কর্মীকে দক্ষ করে, যার ফলে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়।
3. **কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি পায়** (Increase in morale of employees) : মনোবল একটি মানসিক অবস্থা যা কোনো ব্যক্তি বা দলকে উজ্জীবিত করতে সাহায্য করে। কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছে বলে ধরা হয় যখন দেখা যায় তাদের কাজের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছে, সংগঠনের লক্ষ্য পূরণে কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রশিক্ষণই কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধিতে সাহায্য করে ফলে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত কর্মীদের মনোবল উঁচুস্তরের হয় যা প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক উদ্দেশ্যসাধনে সাহায্য করে।
4. **মানবিক সম্পর্ক উন্নত হয়** (Develops human relations) : প্রতিষ্ঠান যত বড়ো হয়

মানবিক সম্পর্ক ততই জটিল আকার ধারণ করে, যেমন—ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দলাদলি বা বিভিন্ন দলের মধ্যে বিরোধ ইত্যাদি। এ জাতীয় সমস্যা তখনই দূর হয় যখন মানবিক সম্পর্ক উন্নত হয়। সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের মধ্যে মানবিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে।

5. **তদারকি ব্যয় হ্রাস পায়** (Reduction in cost of supervision) : প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত কর্মীরা স্বাভাবিকভাবেই আত্মনির্ভর। অন্যের দ্বারা তদারকি তারা পছন্দ করে না। ব্যবস্থাপকদের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীরা দায়িত্বশীল ও তাদের নিয়ন্ত্রণ করা অন্য কর্মীদের থেকে সহজ হয় এবং সেজন্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কর্মীদের উপর থেকে তদারকির পরিমাণ হ্রাস করতে পারলে ব্যবস্থাপকগণ অন্যান্য কাজ, যেমন—পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর অধিক দৃষ্টি দিতে পারেন। এর ফলে কাজের সম্পাদন দ্রুত ও সহজ হয়। সুতরাং প্রশিক্ষণের ফলে তদারকি ব্যয় হ্রাস পায় ও ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজ সম্পাদনে সুবিধা হয়।

6. **কাজের ক্ষতি কম হয় ও দুর্ঘটনা এড়ানো যায়** (Reduction in damage of work and avoidance of accidents) : প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত কর্মী যে কাজের জন্য নির্বাচিত হয় সে কাজ সম্বন্ধে তার পূর্ণাঙ্গ ধারণা জন্মায়। ফলে কাজের ক্ষতি কম হয় ও দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়।

7. **মনুষ্যশক্তির গুণগতমানের হ্রাস রোধ করা** (Prevention of obsolescence of manpower) : পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রতিষ্ঠান নিজেকে পরিবর্তন করতে না পারলে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে না, এটাই রীতি। যেসব সম্পদ নিয়ে প্রতিষ্ঠান তার কাজের ধারা সচল রাখে সেসব সম্পদের গুণগত মানের পরিবর্তন করা উচিত। সেদিক দিয়ে বিচার করলে মনুষ্যশক্তিরও গুণগত পরিবর্তন দরকার। পুরানো ধ্যান-ধারণা পুষ্ট মনুষ্যশক্তি প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। মনুষ্যশক্তিকে নতুন ধারণায় সমৃদ্ধ করতে তাদেরকে সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে তোলা হয়। তাই প্রশিক্ষণ অপ্রচলিত মনুষ্যশক্তির প্রভাব হ্রাসে সাহায্য করে।

8. **সংগঠনের দায়িত্ব ও নমনীয়তা বৃদ্ধি পায়** (Increases the stability and flexibility of organisation) : কোনো প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারাকে স্থায়িত্ব বলে এবং বাহ্যিক পরিবেশের মধ্যে কোনো পরিবর্তন ঘটলে সংগঠন যদি সেই পরিবর্তনের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে তাহলে তাকে নমনীয়তা বলে। এই দুই বিশেষ অবস্থায় একমাত্র সেই প্রতিষ্ঠানই টিকে থাকতে পারে যার পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত কর্মী থাকে। প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত কর্মী থাকলে অস্তিত্বের সংকট মোকাবিলা করা সম্ভব হয় এবং কাজের প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটলেও তাদের দিয়ে সেই কাজ করানো সম্ভব হয়।

9. **উপযোগিতা** (Utility) : বর্তমান বিশ্বে কারিগরি পরিবর্তন দ্রুত ঘটে চলেছে এবং কোনো

কারবারি প্রতিষ্ঠান এই পরিবর্তনের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পারলে টিঁকে থাকতে পারে না। প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত কর্মীদের এই কারিগরি পরিবর্তন সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়, যা প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি বজায় রাখতে সাহায্য করে। সুতরাং নতুন ধ্যান-ধারণার গ্রহণযোগ্যতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই সম্ভব হয়।

10. **ভারার্পণ** (Delegation of authority) : ব্যবস্থাপক কর্মীদের মধ্যে বিশেষ কাজের দায়িত্ব বণ্টন করেন এবং এই দায়িত্ব সাধারণত তাদেরই দেওয়া হয় যারা কাজ ও দায়িত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ও সচেতন থাকে। প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত কর্মীরা এই উভয় বিষয়েই সচেতন থাকে। সুতরাং ভারার্পণ তাদের ক্ষেত্রেই যুক্তিযুক্ত।

11. **শ্রমিক আবর্তন ও অনুপস্থিতি হ্রাস** (Reduction of labour turnover and absenteeism) : প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যাতে তারা কাজ করার মাধ্যমে তৃপ্তি (satisfaction) পায়। কাজের মধ্যে আনন্দ খুঁজে পাওয়ার এই বিশেষ মানসিকতা, শ্রমিক ও শিল্পের মধ্যে গভীর যোগসূত্র সৃষ্টি করে, যার ফলে শ্রমিক আবর্তন ও অনুপস্থিতি হ্রাস পায়।

৭.৫ কর্মী-প্রশিক্ষণের সুবিধা (Benefits of Training)

প্রশিক্ষণ একটি সংগঠিত পদ্ধতি যার মাধ্যমে কর্মীরা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যপূরণের জন্য জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে। প্রশিক্ষণ থেকে যেসব সুবিধা পাওয়া যায় সেগুলিকে তিনটি দিক থেকে বিচার করা হয়—(1) সংগঠনের দিক থেকে, (2) কর্মীর দিক থেকে এবং (3) প্রতিষ্ঠানের নীতি কার্যাকরী করার দিক থেকে। নীচে সেগুলি আলোচিত হল।

I. সংগঠনের দিক থেকে সুবিধা (Benefits from Organisation point of view)

প্রশিক্ষণ সংগঠনকে যেসব সুবিধা প্রদান করে সেগুলি হল :

1. সংগঠনের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়;
2. সংগঠনের সর্বস্তরে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়;
3. কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধিতে সাহায্য করে;
4. সংগঠনের উদ্দেশ্যের সাথে কর্মীদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যের মেলবন্ধন ঘটায়;
5. কোম্পানি সম্বন্ধে জনমানসে একটি উজ্জ্বল ধারণা সৃষ্টিতে সাহায্য করে;
6. কর্মীদের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা ও নির্ভরশীলতা বাড়াতে সাহায্য করে;
7. উপরওয়ালা বা উর্ধ্বতন কর্মী ও সাধারণ কর্মীর মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে;
8. সাংগঠনিক উন্নতিতে সাহায্য করে;

9. শিক্ষাধীন (Trainee) ব্যক্তির কাছ থেকেও সংগঠন শিক্ষা নেয়;
10. কাজ কীভাবে করতে হবে সে সম্পর্কে কর্মসূচি প্রস্তুত করা সম্ভব হয়;
11. সংগঠনের নীতিসমূহ বুঝতে ও পালন করতে সাহায্য করে;
12. সংগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কী জাতীয় পরিবর্তন হতে পারে ও সেগুলি কীভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হবে তা নির্ণয় করা যায়;
13. কর্মীদের মধ্যে থেকে পদোন্নয়ন কীভাবে সম্ভব তা নির্ধারণ করা যায়;
14. সংগঠনে কার্যকরী সিদ্ধান্ত কীভাবে নেওয়া সম্ভব এবং কীভাবে সমস্যা মেটানো যায় তা ঠিক করা সম্ভব হয়;
15. নেতৃত্বের দক্ষতা, কাজের প্রতি মনোযোগ কীভাবে বাড়ানো যায় তা দেখা সম্ভব হয়;
16. উৎপাদন, কর্মী সমন্বয়, আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত ক্ষেত্রে কীভাবে ব্যয় কমানো সম্ভব সে সম্পর্কে পথনির্দেশ দেয়;
17. কোম্পানির সার্বিক উন্নয়ন এবং যোগাযোগ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে।

II. কর্মীর দিক থেকে সুবিধা (Benefits from Employees' point of view)

প্রশিক্ষণ থেকে কর্মীরা যেসব সুবিধা পান পক্ষান্তরে সংগঠন সেগুলি থেকে উপকৃত হয়। সুবিধাগুলি হল নিম্নরূপ :

1. কর্মীরা যথাযথভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ও সমস্যা দূরীকরণে সমর্থ হয়;
2. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের মধ্যে কর্ম সম্পাদন, দায়িত্ব ও আরও এগিয়ে যাবার মানসিকতা জন্ম নেয়;
3. কর্মীদের মধ্যে ব্যক্তিগত উন্নয়ন এবং আস্থার মনোভাব সৃষ্টি হয়;
4. কর্মীরা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কঠিন চাপের মুখে হতাশায় ও দ্বন্দ্বের সামনে কীভাবে কাজ করতে হবে, সে সম্পর্কে জানতে পারে;
5. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের মধ্যে নেতৃত্ব, জ্ঞান, যোগাযোগ ক্ষমতা এবং আচরণগত দক্ষতা বৃদ্ধি পায়;
6. কর্মীরা কাজে সন্তুষ্টি ও যোগ্যতার পুরস্কার পায়;
7. প্রশিক্ষণদাতা ও প্রশিক্ষণ গ্রহীতা উভয়েই সন্তুষ্ট হন;
8. কর্মীদের মধ্যে কাজ শেখবার মানসিকতা বৃদ্ধি পায়;
9. নতুন কোনো কাজ শুরু করার সময় কোনো ভয় বা সঙ্কোচ থাকে না।

III. প্রতিষ্ঠানের নীতি কার্যকর করার দিক থেকে সুবিধা (Benefits from the point of view of Policy Implementation)

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবিক সম্পর্ক, দলগত সমন্বয় ও প্রতিষ্ঠানের নীতি যথাযথভাবে কার্যকর করা সম্ভব হয়। প্রশিক্ষণ কীভাবে প্রতিষ্ঠানের নীতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে সাহায্য করে সেগুলি নীচে আলোচিত হল :

1. বিভিন্ন দল এবং ব্যক্তির মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, যার ফলে প্রতিষ্ঠানের নীতি বাস্তবায়িত হয়;
2. নতুন কর্মীদের নতুন ধারণা প্রদান এবং পুরানো কর্মীদের পদোন্নতি ও বদলির মাধ্যমে নতুন কাজে যোগদানে সাহায্য করে;
3. কর্মীদের পারস্পরিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে;
4. কর্মীদের শিক্ষাগ্রহণ, উন্নয়ন ও সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, যার ফলে সংগঠনের নীতি বাস্তবায়িত হয়।

৭.৬ কর্মী প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়া ও ধাপ (Process and Steps in Employee Training)

প্রশিক্ষণ একটি ব্যয়বহুল সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। সুতরাং প্রশিক্ষণ সম্বন্ধে সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। যে-কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের জন্য নীচের ধাপগুলি অনুসরণ করা হয় :

1. **সংগঠনের উদ্দেশ্য ও কৌশল** (Organisational Objectives and Strategy) **:** কর্মী প্রশিক্ষণের প্রথম ধাপ হল সংগঠনের উদ্দেশ্য ও কৌশল সম্পর্কে মূল্যায়ন করা। কী ধরনের কারবারে কর্মী যোগদান করেছে? কী পরিমাণ পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখতে হবে? ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠান কোথায় পৌঁছাতে চায়? কর্মী প্রশিক্ষণের আগে এই প্রশ্ন ও সেগুলির সম্ভাব্য উত্তর সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন এবং সেই অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
2. **প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ** (Identifying training needs) **:** কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া তখনই সার্থক হয় যখন প্রতিষ্ঠানের বিশেষ উদ্দেশ্যপূরণে তা কাজে লাগে। প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার জন্য তিনটি বিষয়ের বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয়। এগুলি হল : (i) সাংগঠনিক বিশ্লেষণ (Organisational Analysis), (ii) কার্যকারিতা বিশ্লেষণ (Operrational Analysis) এবং (iii) কর্মী বিশ্লেষণ (Worker Analysis)। এই তিনটি বিষয়ের বিশ্লেষণের মাধ্যমে

কর্মী ব্যবস্থাপক ঠিক করবে সংগঠনের কোন্ স্তরে, কী জাতীয় কাজের জন্য, কোন্ ধরনের কর্মী আবশ্যক এবং কোন্ কোন্ কর্মীর জন্য কী ধরনের প্রশিক্ষণ দরকার।

3. **প্রশিক্ষণের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা** (Establishment of Training Goals) : কর্মী-প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ঠিক করতে হবে। প্রশিক্ষণ এমন হবে যার ফলে শুধু সংগঠন নয়, কর্মীরাও উপকৃত হয়। সুতরাং প্রশিক্ষণের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হল কর্মী-প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার তৃতীয় ধাপ।
4. **কাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে** (Who is to be trained?) : কর্মী-প্রশিক্ষণের পরবর্তী ধাপের মধ্যে পড়ে কোন্ ধরনের শ্রমিকের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন—নতুন কর্মী বা পুরানো কর্মী। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মী ব্যবস্থাপক ঠিক করেন কোন্ কোন্ কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
5. **প্রশিক্ষণ প্রাপকদের তৈরি করা** (Preparation of learner) : যেসব কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে তাদেরকে (i) নতুন কাজ সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া; (ii) কেন তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে তা জানানো; (iii) নতুন কাজের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি করা; (iv) নতুন যন্ত্রপাতি বা কাজের পদ্ধতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা ইত্যাদি হল কর্মী-প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার একটি ধাপ।
6. **প্রশিক্ষণের কর্মসূচি প্রস্তুতকরণ** (Preparation of training operation) : কর্মী-প্রশিক্ষণের এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। যিনি প্রশিক্ষণ দেবেন (Trainer) তিনি সুস্পষ্টভাবে কর্মীদের প্রতিটি কাজ বুঝিয়ে দেবেন, ব্যাখ্যা করবেন এবং প্রশ্ন করবেন।
7. **প্রশিক্ষণ প্রাপকদের পরীক্ষা গ্রহণ** (Examining the learner) : উপরিউক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার পর প্রশিক্ষণরত কর্মীদের বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কে মূল্যায়ন করা হয়। যেমন—কীরকম শিক্ষা তারা গ্রহণ করেছে, শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হয়েছে কিনা, যারা শিক্ষা প্রদান করেছেন তাদের সম্পর্কে অভিমত ইত্যাদি।
8. **প্রশিক্ষণের ফলাফলের মূল্যায়ন** (Evaluation of Results) : এটি প্রশিক্ষণের সর্বশেষ ধাপ। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীরা কতটা সংগঠনের পক্ষে উপযুক্ত হয়েছে, তাদের মানসিকতার কতখানি পরিবর্তন ঘটেছে ইত্যাদি সম্পর্কে মূল্যায়ন করার মাধ্যমে কর্মী-প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়া শেষ হয়। যদি দেখা যায় কর্মীরা যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত হয়নি, পুনরায় প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়া শুরু হবে।

৭.৭ প্রশিক্ষণ পদ্ধতি (Methods of Training)

প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য হল কর্মীদের মনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা যার ফলে কর্মীরা সংগঠনমুখী হয় ও কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে তৃপ্তি লাভ করে। প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কর্মীর মূল লক্ষ্য হওয়া

উচিত—এই বিশেষ ধারণা কর্মীদের মধ্যে সৃজন করার জন্য বিভিন্নপ্রকার প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রচলিত আছে যা নিচে আলোচিত হল।

A. কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণ পদ্ধতি (On the Job Training Method) :

এই জাতীয় প্রশিক্ষণ পদ্ধতি সব ধরনের কর্মীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। একজন কর্মীকে কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান এই পদ্ধতির মূল কথা। এই প্রশিক্ষণ পদ্ধতিগুলি হল :

1. **নির্দিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে** (On Specific Job) : শিল্প প্রতিষ্ঠানে এই পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ খুবই প্রচলিত। একজন কর্মীকে কোনো নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব দিলে সেই কাজের মাধ্যমে সে শিক্ষা গ্রহণ করে ও ধীরে ধীরে সেই কাজে অভিজ্ঞতা (Experience) সঞ্চয় করে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে কর্মীদের আরও দক্ষ হওয়ার সুযোগ ঘটে যদি তারা অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা সেই কাজ সম্বন্ধে আরও ধারণা (Understanding) ও কোচিং (Coaching) পায়।

2. **কোচিং** (Coaching) : কোচিং হল কর্মরত অবস্থায় কার্যকরী প্রশিক্ষণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে একজন ব্যক্তি থাকেন যিনি নির্দিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী। তাকে প্রশিক্ষক বা কোচ বলা হয়। তিনি কর্মীদেরকে তার অভিজ্ঞতার আলোকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। এতে কর্মীরা প্রশিক্ষকের সাথে সহজে মেশবার সুযোগ পান ও আলাপ আলোচনা করতে পারেন এবং দক্ষতা অর্জন করতে পারেন।

3. **প্রতিকল্প** (Understudy) : নতুন কোনো কর্মীর প্রশিক্ষণ দিতে হলে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট কর্মীকে কোনো অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপকের অধীনে তার প্রতিকল্প হিসাবে রাখতে হয় ও কাজ শেখার সুযোগ দিতে হয়। এতে কর্মীরা অভিজ্ঞ ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে দৈনন্দিন সমস্যা সম্পর্কে জানতে পারেন ও সেই মতো সিদ্ধান্ত নিতে সমর্থ হন।

4. **সহযোগীর সাহায্য** (Help of assistant) : কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে সহযোগী অনেক সময় খুব ভালো প্রশিক্ষক হিসাবে কাজ করে। কারণ সকলের বুদ্ধি সমান হয় না। অনেক সময় দেখা যায় কোনো সহযোগী অন্য সহযোগীর থেকে বুদ্ধিতে বেশি। প্রতিষ্ঠান যদি খেয়াল করে সংশ্লিষ্ট সহযোগী কম বুদ্ধি-সম্পন্ন কর্মীকে সাহায্য করতে সক্ষম হচ্ছে, সেক্ষেত্রে সহযোগীকে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করে।

5. **পদের আবর্তন** (Position Rotation) : কর্মীকে সংগঠনের বিভিন্ন কাজে যুক্ত করলে সে তার স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে সেসব কাজ সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারে এবং প্রয়োজনে তাকে দিয়ে বিভিন্ন কাজ করানো সম্ভব হয়। তাই কর্মীকে সংগঠনের বিভিন্ন পদের কাজ করিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

6. **শিক্ষানবীশ** (Apprenticeship) : এই পদ্ধতির মাধ্যমে কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির অধীনে কর্মীকে হাতে কলমে কাজ করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই জাতীয় পদ্ধতি শিল্প প্রতিষ্ঠানে খুব বেশি দেখা যায়। এই প্রশিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে কর্মীরা দক্ষ হয়ে উঠে এবং মূল কাজের সাথে যুক্ত হয়।

7. **বিশেষ প্রকল্প** (Special Projects) : পদের আবর্তন পদ্ধতির মতো এই পদ্ধতিতে কর্মীকে বিশেষ প্রকল্পে কাজ করতে বলা হয়। তবে শুধুমাত্র প্রকল্পে নয়, বিভিন্ন দল বা কমিটির সাথেও কর্মীকে কাজ করতে বলা হয়। এর ফলে বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে কীভাবে মিলেমিশে কাজ করতে হয় সে সম্বন্ধে কর্মী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

B. কাজের বাইরে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি (Off-the Job Training Method) :

এই পদ্ধতি অনুযায়ী কর্মী তার কাজের স্থান পরিত্যাগ করে ও প্রশিক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ সময় ব্যয় করে। অর্থাৎ প্রশিক্ষণের সময় কর্মী প্রতিষ্ঠানের মূল কাজের সাথে যুক্ত থাকে না। এ সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাহায্যে বা প্রফেশনাল ইনস্টিটিউটের (যেমন, বিভিন্ন ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট) মাধ্যমে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়। এই প্রশিক্ষণ যে পদ্ধতিতে দেওয়া হয় সেগুলি হল :

1. **বিশেষ পাঠক্রম** (Special Course) : কর্মীদের বিশেষ পাঠক্রমের মাধ্যমে কাজ সম্বন্ধে তত্ত্বগত ধারণা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন প্রফেশনাল ইনস্টিটিউট বা নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সহায়তায় কর্মীদের এই ধারণা দেওয়া হয়। এই জাতীয় পদ্ধতি আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত।

2. **ঘটনা পর্যালোচনা** (Case Study) : আমেরিকার হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল এই পদ্ধতি প্রবর্তন করে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে কোনো প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিষয় (যেমন—তার ইতিহাস, মূল কাজ, আর্থিক কাঠামো ইত্যাদি) সম্বন্ধে পর্যালোচনা করতে বলা হয়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিশ্লেষণমূলক গুণ আছে কিনা সে সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব হয়। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সমস্যাকে বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করা, ঘটনা পর্যালোচনার অন্তর্গত বিষয়।

3. **আলোচনা সভা** (Conference) : শুধু বক্তব্যনির্ভর (lecture) পদ্ধতির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ যথেষ্ট নয় কারণ এক্ষেত্রে প্রশিক্ষক তাঁর অভিজ্ঞতাই শুধু কর্মীদের জানান। উভয়পক্ষের আলোচনার সুযোগ সাধারণত কম থাকে। তাই প্রশিক্ষক ও শিক্ষাগ্রহণকারী কর্মী উভয়ই আলোচনার মধ্যে অংশগ্রহণ করতে পারলে অবস্থার উন্নতি হয় ও শিক্ষার্থী নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে পারেন।

4. **লেকচার** (Lecture) : কর্মীদের কোনো বিশেষ কাজ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য কোম্পানির বাইরে থেকে অভিজ্ঞ ব্যক্তি নিয়ে এসে লেকচার দেওয়ানো হয়। যেমন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টের ব্যক্তিদের দ্বারা দেয় লেকচার কর্মীদের কাজ সম্পর্কে বিশেষ ধারণা দেয় ও তারা উপকৃত হয়।

5. **চলচ্চিত্র** (Film) : কাজের বাইরে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি হিসাবে চলচ্চিত্র বহু প্রচলিত। কোম্পানির সার্বিক উন্নতিকল্পে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে, কীভাবে সমস্যা মেটানো সম্ভব এইসব নিয়ে বর্তমানে বহু ডকুমেন্টারি চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। কোম্পানি সেইসব সমস্যা সমাধানে কর্মীদের চলচ্চিত্র দেখিয়ে উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

6. **ছদ্মবেশ ধারণ** (Simulation) : এই প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে কোম্পানি প্রশিক্ষণের সময় কাজের পরিবেশের বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় কর্মীরা কীভাবে সেই পরিবেশে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হচ্ছে তার নমুনা দেওয়া হয় ও কর্মীরা সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা হয়। এটি একটি গাণিতিক আদর্শবাদী প্রশিক্ষণ পদ্ধতি।

7. **গবেষণাগার প্রশিক্ষণ** (Laboratory Training) : যেসব সংস্থায় কর্মীদের কোনো গবেষণাগারে কাজ করতে হয়, সেসব ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য কোম্পানি গবেষণাগারে বা অন্য কোনো সংস্থার গবেষণাগারে নিয়ে গিয়ে কর্মী-প্রশিক্ষণ দিতে হয়। এই প্রশিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে কর্মীদের ব্যক্তিগত আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আসতে সাহায্য করে।

8. **ভূমিকা পালন** (Role Playing) : এই পদ্ধতি অন্যান্য প্রশিক্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষানবীশকে বিভিন্ন ভূমিকায় কাজ পরিচালনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। অর্থাৎ তাকে প্রকৃত পরিদর্শকের ভূমিকা পালন করতে দেওয়া হয়। ফলে বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হলে কর্মী কতখানি যোগ্যতার সাথে তার মীমাংসা করতে পারবে ভূমিকা পালনের মাধ্যমে সে সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়।

9. **মস্তিষ্ক প্রসূত চিন্তাধারার সৃষ্টি** (Brain Storming) : আমেরিকার এক কোম্পানিতে 1938 সালে Osborn সাহেব এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। Osborn-এর মতে মস্তিষ্ককে ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যার মোকাবিলা করা হল Brain Storming *(Using the brain to storm the problem)*। এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক শিক্ষানবীশকে যে-কোনো একটি সমস্যা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করতে বলা হয় এবং শিক্ষানবীশরা নির্দ্বিধায় তাদের মত প্রকাশ করার সুযোগ পায়। তাদের প্রকাশিত মতগুলি যত্ন সহকারে পরীক্ষা করার পর যেটি ভালো বলে বিবেচিত হয় শিক্ষানবীশকে তা জানানো হয়। এর ফলে সে উৎসাহিত হয়।

10. **অনুভূতি-সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ** (Sensitivity Training) : এই প্রশিক্ষণ পদ্ধতি অন্যান্য সব

পদ্ধতি থেকে পৃথক ও বিতর্কিত পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃত। আমেরিকার বেথলেহেম (Bethlehem) শহরে National Training Laboratories প্রতিষ্ঠানে এই পদ্ধতি প্রথম প্রয়োগ করা হয়। একটি বিশেষ বিতর্কিত অবস্থায় শিক্ষানবীশদের ছোটো ছোটো দল কীভাবে তাদের অনুভূতি বা মত প্রকাশ করে তা পর্যালোচনা করাই হল এই পদ্ধতির অন্তর্নিহিত বিষয়।

11. **উপ-প্রকোষ্ঠ প্রশিক্ষণ** (Vestibule Training) : এই পদ্ধতিতে কর্মীকে এমন একটি কাজ করতে বলা হয় যা তার মূল কাজের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত। ফলে সে যখন মূল কাজে যোগদান করে তখন তার কাছে ওই কাজ নতুন বলে মনে হয় না। যেমন, উৎপাদন ব্যবস্থায় যে জাতীয় যন্ত্রপাতির সামনে কর্মীকে কাজ করতে হবে, ঠিক সেই জাতীয় যন্ত্রপাতির সঙ্গে কর্মীকে পরিচয় করানো ও সেই যন্ত্রপাতি কীভাবে চালনা করতে হয় সে সম্বন্ধে ধারণা প্রদান করাই হল উপ-প্রকোষ্ঠ মাধ্যমে প্রশিক্ষণ।

৭.৮ কর্মী-উন্নয়ন (Employee Development)

সংজ্ঞা (Definition) : যে-কোনো সংগঠনের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে কর্মীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সুতরাং কর্মীদের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য, দক্ষতা, জ্ঞান, ক্ষমতা ইত্যাদির উন্নয়নের মাধ্যমে সংগঠন তার মূল লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। সুতরাং কর্মী-উন্নয়ন হল কোম্পানি দ্বারা পরিচালিত এমন এক পরিকল্পিত এবং সংঘটিত প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে কর্মীদের উপরোক্ত গুণাবলি ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং যার সাহায্যে কর্মীরা বর্তমানে যে কাজ করছেন তা আরও দক্ষতার সাথে করতে পারেন এবং ভবিষ্যতে কোম্পানিতে তাদের দায়িত্ব বাড়লে সেই দায়িত্ব কার্যকরীভাবে সমাপন করতে পারেন।

উন্নয়ন অর্থাৎ কর্মী-উন্নয়ন একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে কর্মীদের ব্যক্তিগত উন্নতি ঘটে। উন্নয়ন বলতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত বিষয় বোঝায়। ভবিষ্যতে কর্মীর উন্নয়ন ঘটাতে মূলত যে দুটি বিষয় লক্ষ করতে হয় সেগুলি হল—(১) কর্মীর শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং (২) কর্মী-প্রশিক্ষণ। শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকলে শুধু প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীর ব্যক্তিগত উন্মেষ ও উন্নয়ন ঘটে না। এগুলি একে অপরের সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করে।

উন্নয়ন শব্দটি প্রচলিত অর্থে সাধারণ কর্মীর সাথে সম্পৃক্ত নয়। বর্তমানে উন্নয়ন বলতে শুধুমাত্র ব্যবস্থাপকের উন্নয়ন বোঝায় না সমস্ত কর্মীর উন্নয়ন বোঝায়। শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ তাদের চিন্তাশক্তির বিকাশ, সমস্যা বোঝবার ক্ষমতাকে সমৃদ্ধ করতে পারে না। এই সব গুণাবলি তখনই কার্যকরীভাবে কাজে লাগে যখন প্রশিক্ষণ ছাড়াও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন তখনই সম্ভব যখন যথাযথ শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণের মিশ্রণ ঘটে। তাই বলা হয় কর্মী ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন (Management Development) যতটা না প্রশিক্ষণমুখী কার্যকলাপ,

তার থেকে বেশি শিক্ষামূলক প্রক্রিয়া। এই শিক্ষামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা তাদের বিশ্লেষণাত্মক এবং বিষয়মুখী ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়।

কর্মী উন্নয়ন সম্পর্কে যেসব চিন্তাবিদ যা ধারণা পোষণ করেন সেগুলি হল নিম্নরূপ :

গ্যারী ডেসলার (Gary Dessler) কর্মী উন্নয়ন সম্পর্কে বলেছেন যে এটি এমন এক কার্যক্রম যা সংগঠনে কর্মরত কর্মীদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত উন্নয়নে প্রভাবিত করে (... activities that influence the personal and professional growth to enhance an individual's job performance and career progression.)

মিশেল আর্মস্ট্রং (Michael Armstrong)-এর মতে উন্নয়ন হল সংগঠন এবং কর্মীর উন্নতির জন্য সংগঠন দ্বারা গৃহীত এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কর্মীর দক্ষতা, ক্ষমতা এবং জ্ঞান বৃদ্ধি পায় (... a process which aims to improve the skills, stilities and knowledge of employees for the betterment of both the individual and organisation.)

৭.৯ ব্যবস্থাপকদের উন্নয়নের পদ্ধতি (Employee Development)

নিম্নলিখিত উপায়ে ব্যবস্থাপকদের উন্নয়ন ঘটে থাকে—

A. কর্মরত অবস্থায় উন্নয়ন (Methods of Developing Managers) :

মূলত চারটি উপায়ে কর্মরত অবস্থায় ব্যবস্থাপকদের উন্নয়ন ঘটে। নীচে সেগুলি আলোচিত হল—

1. **কোচিং** (Coaching) : যখন কোনো ব্যবস্থাপক অন্য ব্যবস্থাপকদের গাইড হিসেবে কাজ করেন সেটিকে কোচিং বলা হয়। খেলার ক্ষেত্রে যেমন প্রশিক্ষক থাকেন, তেমনি এখানেও ব্যবস্থাপকরা প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। কর্মীদের উন্নতিকল্পে কীভাবে কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে ব্যবস্থাপকদের নির্দিষ্ট পথনির্দেশ, উপদেশ এবং সাজেশন কোচিং-এর অন্তর্গত। এ প্রসঙ্গে সেজন্য **জেমস বোল্ট** (James Bolt) বলেছেন যে, ''কার্যকরী প্রশিক্ষক কর্মীদের উন্নতির জন্য নির্দেশ, উপদেশ এবং অভিভাবকের মাধ্যমে পথ-নির্দেশ দেন" *(The effective coach gives guidance through direction, advice and suggestions in an attempt to aid the growth of the employee.)*।
2. **প্রতিকল্প কার্যভার** (Understudy Assignment) : অনেক প্রতিষ্ঠানে দেখতে পাওয়া যায় যখন কাজের চাপ কম থাকে তখন ব্যবস্থাপকদের বিশেষ দক্ষতা অর্জন করার জন্য তাদেরকে কোনো কাজের ভার দেওয়া হয়। যে সময়ে এই কাজের ভার দেওয়া হয় তাকে Summer Month বলে। এই সময়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কৌশল শেখার জন্য তাদের পাঠানো হয়। এই কাজকে প্রতিকল্প কার্যভার বলে। এর ফলে প্রশিক্ষণরত কোনো ব্যবস্থাপক অভিজ্ঞ

ব্যবস্থাপকের সান্নিধ্যে আসতে পারেন এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যা কীভাবে মোকাবিলা করা যায় সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হন এবং এইভাবে তাদের উন্নয়ন ঘটে।

3. **কাজের আবর্তন** (Job Rotation) : কাজের আবর্তন এমন একটি পদ্ধতি যার সাহায্যে ব্যবস্থাপককে বিভিন্ন কাজের মধ্যে রেখে তার জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। তারা নতুন নতুন অবস্থা বা সমস্যার সম্মুখীন হন এবং কীভাবে সেসব সমস্যা দূর করা যায় তার দিকেও সযত্ন দৃষ্টি দিতে পারেন। একই কাজে না থাকার ফলে তাদের মধ্যে অবসাদ আসতে পারে না। কাজের আবর্তনের ফলে ব্যবস্থাপকদের সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়। অপরদিকে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপকরাও তাদের কাজের মান উন্নয়ন করতে সক্ষম হন।

4. **কমিটি কার্যভার** (Committee Assignment) : কোনো কমিটিতে কাজ করানোর সুবিধা হল একসাথে কাজ করতে সক্ষম হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে একটি মূল্যায়ন করা। কমিটিতে কাজ করতে গিয়ে ব্যবস্থাপকরা মত বিনিময়ের সুযোগ পান এবং সকলে মিলে সংগঠনের সমস্যা কীভাবে মেটানো যায় সে সম্পর্কে ধারণা করতে পারেন। এর ফলে ব্যবস্থাপকদের ব্যক্তিগত উন্নয়ন যেমন ঘটে, তেমনি সংগঠনও উপকৃত হয়।

B. কাজের বাইরে উন্নয়ন (Off the Job Development) :

কাজের বাইরে উন্নয়ন পদ্ধতির মাধ্যমেও ব্যবস্থাপকদের উন্নয়ন ঘটে। নীচে সেসব পদ্ধতি আলোচিত হল—

1. **অনুভূতি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ** (Sensitivity Training) : এই পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ খুব প্রচলিত হয়েছিল 1950-এর দশকে। দলগত প্রচেষ্টায় ব্যবহারগত পরিবর্তন কীভাবে করা যায় সে সম্পর্কে এই প্রশিক্ষণ আলোকপাত করে। একটি বিশেষ বিতর্কিত অবস্থায় বিভিন্ন শিক্ষানবিশ ব্যবস্থাপকদের ছোটো ছোটো দল কীভাবে তাদের অনুভূতি বা মত প্রকাশ করে তা পর্যালোচনা করাই হল এই পদ্ধতির অন্তর্নিহিত বিষয়। এই পদ্ধতির ফলে ব্যবস্থাপকরা তাদের নিজস্ব ব্যবহার সম্বন্ধে সচেতন হতে পারেন, অন্যেরা তাদেরকে কীভাবে গ্রহণ করছে সে-সম্পর্কেও অবহিত হতে পারেন এবং এরই মাধ্যমে তাদের উন্নয়ন ঘটে।

2. **লেকচার পদ্ধতি** (Lecture Method) : আনুষ্ঠানিক লেকচার (Formal lecture) পদ্ধতি ব্যবস্থাপকদের বিভিন্ন জ্ঞান আহরণে সাহায্য করে এবং তাদের মধ্যে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা জাগ্রত করে। বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানে এই পদ্ধতি প্রতিষ্ঠানে আয়োজন করা হয়। তবে অনেক সময় প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের সাহায্যে সেখানে গিয়ে ব্যবস্থাপকদের এই পদ্ধতির মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করে।

3. **ছদ্মবেশ ধারণ** (Simulation) : যদিও ছদ্মবেশ ধারণ প্রশিক্ষণের একটি পদ্ধতি, তথাপি

ব্যবস্থাপকদের উন্নয়নে এই প্রথা কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এই পদ্ধতিতে কোম্পানি ব্যবস্থাপকদের একটি বাস্তবসম্মত সমস্যার পরিবেশ সৃষ্টি করে। সেই অবস্থায় তারা কীভাবে সমস্যার মোকাবিলা করছে, কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যবস্থাপকদের মানোন্নয়নও সম্ভব হয়।

4. **ভূমিকা পালন** (Role Playing) **:** এই পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপককে বিভিন্ন ভূমিকায় কাজ পরিচালনা করতে দেওয়া হয়। বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হলে তিনি কীভাবে কতখানি যোগ্যতার সাথে সেই অবস্থা সামাল দিতে পারছেন সে-সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব হয়। এতে ব্যবস্থাপকদের উন্নয়নও ঘটে।

৭.১০ সারাংশ

কর্মীদের কাজ করার সামর্থ্য ও কাজের প্রতি তাদের উৎসাহ সংগঠনের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। শুধুমাত্র সামর্থ্য ও উৎসাহ কর্মীদেরকে দক্ষ করে তোলে না। এর জন্য প্রয়োজন কর্মী প্রশিক্ষণ। কর্মী প্রশিক্ষণ হল একটি জ্ঞান অর্জনের অভিজ্ঞতা, যার মাধ্যমে কর্মীদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন সূচিত হয় ও কর্মীরা তাদের কাজের ক্ষমতা বাড়াতে সক্ষম হয়। কর্মী প্রশিক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। কর্মী উন্নয়ন হল কোম্পানি দ্বারা পরিচালিত এমন এক পরিকল্পিত এবং সংঘটিত প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে কর্মীদের গুণাবলি ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং যার সাহায্যে কর্মীরা বর্তমানে যে কাজ করছেন তা আরও দক্ষতার সাথে করতে পারেন ও যার ফলে তাঁরা তাঁদের পেশাগত উন্নয়ন ঘটাতে পারেন। এই এককে এই সকল বিষয়গুলি বিশদে আলোচিত হয়েছে।

৭.১১ অনুশীলনী

ক) বহুপছন্দ ভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। কোনো নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য কোনো কর্মীর জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে বলে __________।

ক) নির্বাচন　　খ) প্রশিক্ষণ

গ) মূল্যায়ন　　ঘ) উন্নয়ন

২। কর্মীদের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি নিচের কোন্‌টির সাহায্যে সম্ভব হয়?

ক) কর্মী নির্বাচন　　খ) কর্মী প্রশিক্ষণ

গ) কার্য পর্যালোচনা　　ঘ) কার্য মূল্যায়ন

৩। কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণ পদ্ধতি কোন্‌টি?

ক) আলোচনা সভা
খ) অনুভূতি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ
গ) উপ-প্রকোষ্ঠ প্রশিক্ষণ
ঘ) সহযোগীর সাহায্য

৪। _________ এমন এক কার্যক্রম যা সংগঠনে কর্মরত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত উন্নয়নে প্রভাবিত করে।

ক) কর্মী প্রশিক্ষণ
খ) কার্য মূল্যায়ন
গ) কর্মী উন্নয়ন
ঘ) কার্য পর্যালোচনা

৫। নিম্নলিখিত কোন্‌টি ব্যবস্থাপকদের কর্মরত উন্নয়নের পদ্ধতি হিসাবে বিবেচিত হয় না?

ক) অনুভূতি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ
খ) কোচিং
গ) প্রতিকল্প কার্যভার
ঘ) কাজের আবর্তন

খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

১। কর্মী প্রশিক্ষণ বলতে কী বোঝায়?

২। কর্মী প্রশিক্ষণের দুটি উদ্দেশ্য লিখুন।

৩। কর্মরত অবস্থায় দুটি প্রশিক্ষণ পদ্ধতি উল্লেখ করুন।

৪। কর্মী উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়?

৫। প্রতিকল্প কার্যভার সম্পর্কে ধারণা দিন।

গ) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

১। প্রশিক্ষণের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

২। কর্মী প্রশিক্ষণের সুবিধাসমূহ আলোচনা করুন।

৩। কর্মী প্রশিক্ষণের ধাপসমূহ আলোচনা করুন।

৪। কর্মী প্রশিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দিন।

৫। ব্যবস্থাপকগণের উন্নয়নের পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করুন।

একক ৮ ❑ কর্ম মূল্যায়ন এবং কার্য সম্পাদন পর্যালোচনা (Job Evaluation and Performance Appraisal)

গঠন

৮.১ উদ্দেশ্য

৮.২ প্রস্তাবনা

৮.৩ কর্ম মূল্যায়ন সংজ্ঞা

৮.৪ কর্ম মূল্যায়নের নীতি

৮.৫ কর্ম মূল্যায়নের গুরুত্ব

৮.৬ কর্ম মূল্যায়নের উদ্দেশ্য

৮.৭ কর্ম মূল্যায়ন পদ্ধতি

৮.৮ কর্ম মূল্যায়নের সুবিধা

৮.৯ কর্ম মূল্যায়নের অসুবিধা

৮.১০ কার্য সম্পাদন পর্যালোচনা

৮.১১ কার্য সম্পাদনের বিবেচ্য বিষয়

৮.১২ কার্য সম্পাদন পর্যালোচনার উদ্দেশ্য

৮.১৩ কার্য সম্পাদন পর্যালোচনার গুরুত্ব

৮.১৪ সারাংশ

৮.১৫ অনুশীলনী

৮.১ উদ্দেশ্য

এই একক থেকে নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে—

- কর্মমূল্যায়নের সংজ্ঞা ও নীতি
- কর্মমূল্যায়নের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব
- কর্মমূল্যায়ন পদ্ধতি
- কর্মমূল্যায়নের সুবিধা ও অসুবিধা
- কার্যসম্পাদন পর্যালোচনা

- কার্যসম্পাদনের বিবেচ্য বিষয়
- কার্যসম্পাদন পর্যালোচনার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

৮.২ প্রস্তাবনা

কর্মমূল্যায়ন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিভিন্ন কাজকে সুসংবদ্ধভাবে বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন করা হয় এবং সংগঠনে তার আপেক্ষিক গুরুত্ব কী তা নির্ধারণ করা হয়। কোনো প্রতিষ্ঠানে পারিশ্রমিকের অসামঞ্জস্যতা দূর করার জন্য কাজের আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণ প্রয়োজন যা কর্মমূল্যায়নের মাধ্যমে করা হয়। কর্মমূল্যায়নের বিভিন্ন নীতি আছে এবং এর গুরুত্ব অসীম। কীভাবে কর্মমূল্যায়ন করা হবে তার কতকগুলি পদ্ধতি আছে। শুধুমাত্র কর্মমূল্যায়ন নয়, কর্ম বিশ্লেষণও সমানভাবে প্রয়োজনীয়। কোনো কাজ কীভাবে করতে হবে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা হল কর্ম বিশ্লেষণ। কর্মীরা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুযায়ী সেই কাজ করতে সমর্থ কিনা তার পর্যালোচনা প্রয়োজন যা কার্য সম্পাদন পর্যালোচনার মাধ্যমে সংগঠিত হয়। এই সকল বিষয় মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। এই বিষয়গুলি এই একক পাঠের মাধ্যমে আপনারা জানতে পারবেন।

৮.৩ কর্ম বা কার্য মূল্যায়ন (Job Evaluation)

সংজ্ঞা (Definition) : বিভিন্ন কাজের আপেক্ষিক গুরুত্ব (Relative importance) বা আপেক্ষিক মূল্য (Relative worth) বিশ্লেষণ (Analysis) ও যাচাইকরণ করাকে কর্ম মূল্যায়ন বলে। কাজেব গুরুত্ব ও মূল্য কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, যেমন—দক্ষতা, যোগ্যতা, দায়িত্ব, বাধাবিঘ্ন, জ্ঞান, কাজের পরিবেশ ইত্যাদি। এই বিষয়গুলি পর্যালোচনা করে কাজের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা হয় ও কর্ম-মূল্যায়ন করা হয়। এই কর্ম-মূল্যায়নের ব্যবহারিক কার্যকারিতা হল পারিশ্রমিক বা বেতন কাঠামো নির্ধারণ। যেহেতু সব কাজের গুরুত্ব সমান নয় সেজন্য বেতন কাঠামোও বিভিন্ন ধরনের হয়। বেতন কাঠামো কী হওয়া উচিত তা নির্ধারণের জন্য কর্ম মূল্যায়ন করা হয়। তবে বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে এই বিষয়ের সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমন—

- **গ্যারী ডেসলার** (Edwin B. Filippo)-এর মতে, ‘‘কর্ম মূল্যায়ন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিভিন্ন কাজকে সুসংবদ্ধভাবে বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন করা হয় এবং সংগঠনে তার আপেক্ষিক গুরুত্ব কী তা নির্ধারণ করা হয়।” *(Job evaluation is a process of analysing and assessing the various jobs systematically to ascertain their relative worth in an organisation.)*।
- **ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন** (International Labour Organisation—ILO)-এর

মতে, ‘‘কোনো কর্মীর ব্যক্তিগত পারদর্শিতা বা কাজ সম্পাদনের ক্ষমতা ছাড়া কোনো বিশেষ কাজ সাধারণভাবে সম্পাদন করার জন্য একজন কর্মীর যে স্বাভাবিক যোগ্যতা প্রয়োজন তা নির্ধারণ এবং তুলনা করার প্রচেষ্টাকে কর্ম মূল্যায়ন বলে।’’ *(...an attempt to determine and compare demands which the normal performance of a particular job makes on normal workers without taking into account the individual abilities or performance of the workers concerned.)*

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলি পর্যালোচনা করলে কার্য-মূল্যায়ন সম্বন্ধে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি সেটি হল কোনো প্রতিষ্ঠানে পারিশ্রমিকের অসামঞ্জস্যতা দূর করার জন্য কাজের আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণের এটি একটি গুণগত পরিমাপ পদ্ধতি। এর উদ্দেশ্য হল কাজের জন্য কত অর্থ প্রদান করতে হবে তা নির্ধারণ করা নয়, কাজের আপেক্ষিক মূল্য নির্ণয় করা।

৮.৪ কর্ম-মূল্যায়নের নীতি (Principles of Job Evaluation)

কর্ম-মূল্যায়নের জন্য কতকগুলি নীতি অনুসরণ করা হয়। এই নীতিগুলি হল—

1. কর্ম-মূল্যায়ন বলতে কাজের মূল্যায়ন বোঝায়। যে কর্মী কাজে নিয়োজিত আছে তার মূল্যায়ন বোঝায় না।
2. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের জন্য মৌলিক উপাদানের মাত্রা নির্ধারণ করতে হয়।
3. যেহেতু প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কাজের বিভিন্ন প্রয়োজন থাকে, সেজন্য কাজের মৌলিক উপাদানগুলি সতর্কতার সাথে নির্বাচন করতে হয়।
4. মূল্যায়নের সাধারণ উপাদানগুলি হল—কাজের বিশ্লেষণ, কাজের বিবরণ, কাজের তুলনা ও আর্থিক মূল্যায়ন। সতর্কতার সাথে মূল্যায়নের এই উপাদানগুলি বিবেচনা করতে হয় এবং সহজভাবে এর ব্যাখ্যা দিতে হয়।
5. ফোরম্যান এবং পরিদর্শককে হয় কর্ম-মূল্যায়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে, নতুবা কর্ম-মূল্যায়নের জন্য গৃহীত পরিকল্পনা ও পদ্ধতি তাদেরকে জানাতে হবে।
6. বিভাগীয় কর্মীদের এই মূল্যায়নের মধ্যে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে যাতে সহযোগিতার ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়।

৮.৫ কর্ম-মূল্যায়নের গুরুত্ব (Importance of Job Evaluation)

কোনো প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কর্মীর পারিশ্রমিকের মধ্যে সামঞ্জস্য আনার জন্য বা উপযুক্ত পারিশ্রমিক নির্ধারণের জন্য কাজের আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণের প্রচেষ্টা হল কর্ম-মূল্যায়ন। প্রতিষ্ঠানে যেসব বিভিন্ন

পদ আছে তাদের তুলনামূলক মূল্য নির্ধারণের এটি একটি কার্যকরী পদ্ধতি। এ প্রসঙ্গে আই. এল. ও. (ILO)-র রিপোর্টের অংশবিশেষ পরপৃষ্ঠায় তুলে ধরা হল—

"কোনো নির্দিষ্ট কারখানায় বা যন্ত্রের সাথে জড়িত বিভিন্ন কাজের আপেক্ষিক মূল্য যুক্তিসঙ্গতভাবে নিরূপণ করা হল কর্ম মূল্যায়নের অধিকাংশ পদ্ধতির লক্ষ্য।"

("The aim of the majority of systems of job evaluation is to establish, on agreed logical basis, the relative values of different jobs in a given plant or machinery.")

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কর্ম মূল্যায়নের গুরুত্ব সম্পর্কে যে ধারণা করা যায় সেগুলি হল নিম্নরূপ—

1. কর্ম-মূল্যায়নের ফলে বিভিন্ন পদের পৃথকীকরণ করা সম্ভব।
2. কোন্ কাজের গুরুত্ব কেমন তা কর্ম-মূল্যায়নের মাধ্যমে নির্ধারণ করা যায়।
3. কর্মীদের মজুরি নির্ধারণের জন্য কর্ম-মূল্যায়ন জরুরি।
4. কর্মীদের পারিশ্রমিকের হারের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা দূর করা সম্ভব হয়।
5. কর্ম-মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রণোদনামূলক মজুরি পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয়।
6. সুস্থ শ্রমিক ও ব্যবস্থাপক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়।

৮.৬ কর্ম-মূল্যায়নের উদ্দেশ্য (Objectives of Job Evaluation)

কর্ম-মূল্যায়নের উদ্দেশ্যগুলি এইভাবে তুলে ধরা যায় :

1. **পারিশ্রমিক** (Remuneration) : কর্ম-মূল্যায়নের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল উপযুক্ত ও ন্যায্য পারিশ্রমিকের পরিমাণ স্থির করা। যদি কোনো কাজের জন্য উচ্চ যোগ্যতা, দক্ষতা ও দায়িত্বের প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।
2. **পদোন্নতি** (Promotion) : কর্ম-মূল্যায়নের মাধ্যমে ব্যবস্থাপকদের পক্ষে কর্মীদের পদোন্নতি কীভাবে হবে, প্রশিক্ষণ কীভাবে দেওয়া হবে, তাদের কীভাবে বিভিন্ন কাজে স্থাপন করা হবে ইত্যাদি বিষয় জানা সম্ভব হয়।
3. **পরিবেশের মান** (Standard of environment) : কাজের পরিবেশের মান উন্নয়নের জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় কর্ম-মূল্যায়নের মাধ্যমে তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।
4. **কাজের আপেক্ষিক গুরুত্ব** (Relative importance of job) : কর্ম-মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রতিটি কাজের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।
5. **বেতন কাঠামো** (Salary structure) : কাজের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণের মাধ্যমে

মজুরি বা বেতন কাঠামো প্রস্তুত করা হয়।

6. **ক্ষমতা ও দায়িত্ব** (Authority & Responsibility) : কর্মীদের দক্ষতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা ও ভার অর্পণ করা কর্ম-মূল্যায়নের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়।
7. **শ্রমিক অসন্তোষ হ্রাস** (Reduction of resentment of employee) : কর্ম-মূল্যায়নের মাধ্যমে একটি কর্মনীতি নির্ধারণ করা সম্ভব হয়, যা পরবর্তী পর্যায়ে কর্মীদের মধ্যে কোনো অসন্তোষ প্রকাশ পেলে, তা মেটাতে সাহায্য করে।
8. **জাতীয় মজুরি কাঠামো** (National wage structure) : প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে কর্ম-মূল্যায়ন সঠিক পদ্ধতিতে হলে জাতীয় স্তরে মজুরি কাঠামো স্থির করা সহজ হয়।

৮.৭ কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methods of Job Evaluation)

একটি কাজকে অন্য কাজের সাথে তুলনা করে তার আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা হয় এবং এই কাজ কর্ম-মূল্যায়নের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। কর্ম-মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে এবং সেগুলি হল সনাতন পদ্ধতি ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি।

A. সনাতন পদ্ধতি (Traditional Methods)

1. মর্যাদাকরণ পদ্ধতি (Ranking Method) : এই পদ্ধতি সাধারণত ছোটো সংস্থায় প্রয়োগ করা হয় যেখানে ব্যবস্থাপক প্রায় সব কাজই জানেন। ব্যবস্থাপক কাজগুলিকে কাজের মর্যাদা অনুযায়ী পরপর সাজান। অর্থাৎ উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তরে বা বিপরীতক্রম অনুযায়ী অর্থাৎ নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর অনুযায়ী কাজগুলি সাজানো হয়। তবে কাজকে সাজানোর আগে প্রতিটি কাজের বিশ্লেষণ ও গুরুত্ব সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

2. কাজের শ্রেণিবিভাগকরণ পদ্ধতি (Job Classification Method) : কাজের শ্রেণিবিভাগকরণ বা কাজের স্তরীকরণ এই পদ্ধতি অনুযায়ী করা হয়। এই পদ্ধতিতে একটি নির্ধারক বা মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয় যারা প্রত্যেকটি কাজের বৈশিষ্ট্য, কাজের জন্য নির্দিষ্ট দায়িত্ব, কাজের উপাদান ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করেন ও সেইমতো কাজের শ্রেণিবিন্যাস করেন। সুতরাং এই পদ্ধতিতে কাজের বিভিন্ন শ্রেণি এবং প্রত্যেক শ্রেণির জন্য পৃথক বেতন স্তর নির্ণয় করা হয়।

B. বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি (Analytical Methods)

1. উপাদানের তুলনা পদ্ধতি (Factor Comparison Method) : এই পদ্ধতিতে সমস্ত রকম কাজের মূল্যায়ন না করে শুধু মূল কাজগুলি (Key Jobs) বেছে নেওয়া হয়। এরপর বেছে নেওয়া কাজগুলিকে পুনরায় এইভাবে বিশ্লেষণ করা হয় :

i) কর্মীর কতখানি মানসিকতার প্রয়োজন (Mental application);

ii) কর্মীর কতখানি শারীরিক দক্ষতার প্রয়োজন (Physical application);

iii) কর্মীর কতখানি দক্ষতার প্রয়োজন (Skill required);

iv) কর্মীর কতটা দায়িত্ব (Responsibility); এবং

v) কাজের কী অবস্থা (Working condition)।

বিশ্লেষণের পর উপরিউক্ত উপাদানগুলির মূল্যায়ন করা হয়। এই মূল্যায়নের মাধ্যমে কাজের গুরুত্ব নির্ণয় করা হয়। সমস্ত কাজগুলির মধ্যে প্রধান কাজ কোন্‌টি তা নির্বাচন করা হয়। অন্যান্য কাজকে তুলনা করার জন্য প্রধান কাজকে মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সমস্ত কাজের মূল্যায়ন করার সময় তাদের প্রত্যেককে অর্থমূল্যে দেখানো হয়।

2. বিন্দু বা মাত্রা পদ্ধতি (Point Method) : কর্ম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যেসব পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় তাদের মধ্যে এই পদ্ধতিটিই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। এই পদ্ধতিতে কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী কতকগুলি বিষয়ের উপর পয়েন্ট বা মাত্রা দেওয়া হয় এবং সেই পয়েন্টগুলি একত্রে যোগ করে এক একটি কাজের মূল্য ঠিক করা হয়। এই বিষয়গুলি হল :

i) মানসিক প্রয়োগ বা শিক্ষা (Mental application or education);

ii) দৈহিক প্রয়োগ বা চেষ্টা (Physical application or effort);

iii) যোগ্যতা, বিশেষ জ্ঞান বা দক্ষতা (Experience, special expertise or skill);

iv) কাজের সফলতা বা ব্যর্থতার দায়িত্ব (Responsibility for achievements or failures);

v) কাজের ঝামেলা বা জটিল শ্রেণির কাজ (Job hazards or complex nature of job);

vi) কাজের অবস্থা (Working conditions)।

এগুলি নির্ধারণ করার পরে প্রকৃতি অনুযায়ী ও প্রতিটি কাজের অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলির গুরুত্ব অনুসারে বিন্দু বা পয়েন্ট আরোপ করা হয় এবং মূল্যায়ন করা হয়। পয়েন্ট বা বিন্দুর সাহায্যে মজুরির হার নির্ণয় করাও সম্ভব হয়।

৮.৮ কর্ম-মূল্যায়নের সুবিধা (Advantages of Job Evaluation)

কর্ম-মূল্যায়নের সুবিধাগুলি হল নিম্নরূপ :

1. **কাজের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়** (Determination of relative importance of job) : কর্ম-মূল্যায়নের মাধ্যমে কাজের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা যায়। কাজের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করার ফলে কোন্ কাজের কী বেতন হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

2. **মানক বেতন কাঠামো নির্ণয়** (Determination of standardised wage structure) : কর্ম-মূল্যায়নের মাধ্যমে একটি যুক্তিসঙ্গত ও মানক বেতনকাঠামো তৈরি করা সম্ভব হয় যার ফলে কর্মীরা কোনো অসন্তোষ প্রকাশের সুযোগ পায় না।

3. **কর্মীদের পদোন্নতি, নির্বাচন ও সংস্থাপনে সাহায্য করে** (Helps in promotion, selection and placement of workers) : কাজের বিশ্লেষণ এবং সঠিক বিবরণ কর্ম-মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই উপাদানগুলি কর্মীদের পদোন্নতি, নির্বাচন ও কাজে স্থাপন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

4. **বেতন কাঠামোতে নমনীয়তা** (Flexibility in wage structure) : কর্ম-মূল্যায়নের মাধ্যমে কাজের বিভিন্ন অবস্থাতে কী বেতন হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করা যায়। সেই দিক দিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটালে বা শ্রমিক সংঘ বেতন বাড়ানোর আবেদন জানালে কী জাতীয় বেতন হওয়া উচিত কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে তা নির্ধারণ করা সহজ হয়।

5. **কর্মী বিরোধের নিষ্পত্তি** (Settlement of worker's dispute) : কর্ম-মূল্যায়নের মাধ্যমে সন্তোষজনক বেতন কাঠামো তৈরি করা যায়। এর ফলে কর্মীদের মধ্যে কোনোরকম অসন্তোষ বা বিরোধ দেখা দেওয়ার সুযোগ থাকে না।

6. **কর্মী সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ** (Other personnel functions) : কর্ম সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ যেমন কৃতিত্ব যাচাইকরণ (Merit rating), উৎসাহবর্ধক মজুরি পরিকল্পনা, কাজের অবস্থার উন্নতিকরণ ইত্যাদি বিষয়গুলির মূল্যায়ন ও উন্নতি ঘটানো কর্ম মূল্যায়নের মাধ্যমে সম্ভব হয়।

৮.৯ কর্ম-মূল্যায়নের সীমাবদ্ধতা (Limitations of Job Evaluation)

কর্ম-মূল্যায়নের যেসব সীমাবদ্ধতা দেখতে পাওয়া যায় সেগুলি হল :

1. **বস্তুগত উপাদানের উপর জোর** (Emphasis on objective factor) : কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতিতে শুধু কাজের বস্তুগত উপাদানগুলি বিবেচনা করা হয়। কিন্তু কাজের যে গুণগত দিক আছে সেগুলি কর্ম মূল্যায়নে উপেক্ষিত হয়।

2. **জটিল পদ্ধতি** (Complex method) : যেসব পদ্ধতিতে কর্ম-মূল্যায়ন করা হয় তা অনেক সময় কর্মীদের বোধগম্য হয় না কারণ পদ্ধতিগুলি জটিল। ফলে পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে কর্মীদের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়।

3. **কর্ম-মূল্যায়ন পরিদর্শক দ্বারা সম্পন্ন হয়** (Job-evaluation is done by Supervisor) : কর্ম-মূল্যায়ন পরিদর্শক দ্বারা সম্পাদিত হয়। যেহেতু পরিদর্শকরা সবসময় এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হন না সেক্ষেত্রে মূল্যায়নও ত্রুটিমুক্ত হতে পারে না।

4. **সমস্ত প্রতিষ্ঠানে প্রযোজ্য হয় না** (Not applicable to all firms) : কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি জটিল ও ব্যয়সাধ্য। সেজন্য সমস্ত প্রতিষ্ঠানে কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি সফলতার সাথে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না।

5. **কর্মী-সম্পর্কে সমস্যা** (Problems in labour relations) : কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি কর্মীদের মানবিক, সামাজিক ও মানসিক সম্পর্কে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে যখন এই পদ্ধতি প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিকভাবে ব্যবহৃত হয়।

6. **সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব** (Lack of overall outlook) : কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ উপাদানের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়, শিল্পের সামগ্রিক উপাদানগুলি বিবেচনা করে না। ফলে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব লক্ষ করা যায়।

৮.১০ কার্য-সম্পাদন পর্যালোচনা (Performance Appraisal)

পর্যালোচনা বলতে কোনো কিছুর গুণ বা যোগ্যতার মূল্যায়ন করাকে বোঝায়। কার্য-সম্পাদন পর্যালোচনা বলতে সাধারণত ব্যবস্থাপক দ্বারা অধস্তন কর্মী সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন করাকে বোঝায়। ব্যবস্থাপকদের কাছে এই পর্যালোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সমস্যাপূর্ণ কাজের মধ্যে পড়ে। কারণ অধস্তন কর্মীর কাজ সম্বন্ধে পর্যালোচনা সবসময় সঠিক নাও হতে পারে। কার্য-সম্পাদন পর্যালোচনাকে অনেকে কৃতিত্ব যাচাইকরণ (Merit Rating) হিসাবেও ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীর ব্যক্তিত্ব এবং কার্য সম্পাদনের যোগ্যতা ও দক্ষতা যাচাই করার পদ্ধতিকে Merit Rating বলে। তাই কৃতিত্ব যাচাই করা থেকে কার্য সম্পাদন পর্যালোচনা শব্দটির অর্থ অনেক ব্যাপক।

সংজ্ঞা (Definition) : কার্য সম্পাদন পর্যালোচনা হল একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অধস্তন কর্মীদের মূল্য, প্রয়োজনীয়তা ও কার্য সম্পাদনের যোগ্যতার মূল্যায়ন করা হয়। প্রতিষ্ঠানে কর্মী নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও অনুপ্রাণিতকরণের পর তাদের কাজের পর্যালোচনা করা হয়। এই পর্যালোচনার মাধ্যমে ব্যবস্থাপক জানাতে পারেন কর্মীরা কত দক্ষতার সাথে তাদের কাজ সম্পাদন করেছে, পর্যালোচনার ফলে যদি কোনো ত্রুটি দেখা যায়, তাহলে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্মীকে জানানো হয় এবং ব্যবস্থাপক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, কার্য-সম্পাদন পর্যালোচনা সংগঠনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার যার সাহায্যে কর্মীদের পদোন্নতি এবং যোগ্যতা বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়। কার্য-সম্পাদন পর্যালোচনার জন্য তাই দরকার প্রয়োজনীয় তথ্য (Information gathering) সংগ্রহ, যার সাহায্যে কর্মীদের মূল্য, প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ের মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়। কার্য-সম্পাদন পর্যালোচনার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি যে বক্তব্য রেখেছেন নীচে সেগুলি তুলে ধরা হল—

- **স্কট, ক্লোদিয়ার এবং স্প্রিগেলের** (Scott, Clothier & Spriegal) মতে : "প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুযায়ী কার্য সম্পাদনে কর্মীর অবদান মূল্যায়ন করা হল কার্য-সম্পাদন পর্যালোচনা।" *(A performance appraisal is a process of evaluating an employee's performance of a job in terms of its requirements.)*
- **হেয়েল** (Heyel)-এর মতে, "কর্মীরা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুযায়ী যে কাজের জন্য নিয়োজিত হয়েছে তাদের কার্য সম্পাদন এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে কার্য-সম্পাদন পর্যালোচনা বলে।" *(It is the process of evaluating the performance and qualifications of the employee in terms of the requuirements of the job for which he is employed.)*
- **বার্লিউ এবং হল** (Berlew and Hall)-এর মতে কার্য-সম্পাদন পর্যালোচনা হল : "কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে একজন কর্মীর আপেক্ষিক মূল্য বা গুরুত্ব ও ক্ষমতা বিচার করার জন্য যে অবিরত প্রক্রিয়া চলে তাকে কার্য সম্পাদন পর্যালোচনা বলে।" *(...a continuous process of judging the relative worth and ability of an employee in performing his job.)*

৮.১১ কার্য-সম্পাদনের বিবেচ্য বিষয় (Factors of Determining Performance)

কর্মীর কার্য সম্পাদন বলতে কোনো কাজ সম্পন্ন করাকে বোঝায়। যেসব বিষয়ের উপর কার্য সম্পাদন নির্ভর করে সেগুলি হল—

1. **কাজ সম্পর্কে ধারণা :** কাজ সম্পর্কে ধারণার (Job knowledge) উপর কার্য সম্পাদন নির্ভর করে। কর্মীর কাজ সম্পর্কে যদি সঠিক ধারণা থাকে তাহলে তার পক্ষে কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয়।
2. **পণ্যের গুণগত ও পরিমাণগত বিষয় :** পণ্যের গুণগত ও পরিমাণগত বিষয়ের উপর কার্য সম্পাদন নির্ভর করে। কর্মীর কাছ থেকে পণ্যের গুণগত ও পরিমাণগত মান যদি বেশি চাওয়া হয়, সেক্ষেত্রে কর্মীরা বেশি যত্ন নিয়ে কাজ করবে, ফলে কার্য সম্পাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।
3. **কাজে ব্রতী করানো :** কর্মীদের কাজে ব্রতী করানো বা ব্যক্তিগতভাবে তারা ব্রতী হওয়ার ওপর কার্য সম্পাদন নির্ভর করে। কাজে কর্মীরা যদি উৎসাহবোধ করে, সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় কার্য-সম্পাদনে তারা এগিয়ে আছে, যা সংগঠনকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে।
4. **নেতৃত্ব দান :** কর্মীর নেতৃত্বদানের ক্ষমতার উপর কার্য সম্পাদন নির্ভর করে। যেসব কর্মীর এই বিশেষ গুণ থাকে, তারা অন্যান্য কর্মীকে কাজে উদ্বুদ্ধ করে কার্য সম্পাদন করে।

5. **পরিদর্শন :** পরিদর্শনের উপর কার্য সম্পাদন নির্ভর করে। প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের কাজের পরিদর্শন সংক্রান্ত কাজ যদি সঠিকভাবে পরিচালিত হয়, সেক্ষেত্রে কর্মীদের কার্য সম্পাদন যথাযথভাবে হওয়া সম্ভব হয়।
6. **নির্ভরশীলতা :** কর্মীদের কাজের প্রতি উপরওয়ালার নির্ভরশীলতা কার্য সম্পাদনের উপর প্রভাব ফেলে। উপরওয়ালা যদি কোনো কর্মীর উপর নির্ভরশীল হন, সেক্ষেত্রে তার কার্য সম্পাদনও সেইভাবে প্রভাবিত হয়।
7. **সহযোগিতা :** কর্মীদের নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি বা হ্রাস পেলে তার উপর কার্য সম্পাদন নির্ভর করে। সহযোগিতা বৃদ্ধি পেলে কার্য সম্পাদন ভালো হয়, সহযোগিতার মনোভাব হ্রাস পেলে কার্য সম্পাদনের উপর তার বিরূপ প্রভাব পড়ে।
8. **বিচক্ষণতা :** কর্মীদের বিচক্ষণতার উপর কার্য সম্পাদনের পরিমাণ নির্ভরশীল। কর্মীরা যত বিচক্ষণ হবেন, কার্য সম্পাদন তত সঠিকভাবে সংগঠিত হবে।
9. **বহুকর্ম শক্তিসম্পন্ন কর্মী :** প্রতিষ্ঠানে বহুকর্ম শক্তিসম্পন্ন কর্মীর পরিমাণ বেশি হলে সেখানে কার্য সম্পাদনের গুণগত ও পরিমাণগত বিষয় সম্পর্কে ভাবতে হয় না। কার্য সম্পাদন সেখানে সঠিকভাবেই সম্পাদিত হয়।
10. **স্বাস্থ্য :** কর্মীর স্বাস্থ্যের উপর কার্য সম্পাদনের পরিমাণ নির্ভরশীল। কর্মীরা যদি দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়, সেক্ষেত্রে তাদের কাছ থেকে যথাযথ কাজ পাওয়া সম্ভব নয়। সেজন্য কার্য সম্পাদন কর্মীর স্বাস্থ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
11. **ব্যবস্থাপনার দর্শন :** ব্যবস্থাপনার দর্শনের উপর কার্য সম্পাদন নির্ভর করে। খুব বেশি নিয়মমাফিক সম্পর্ক বা অনিয়মমাফিক সম্পর্ক সংগঠনের ক্ষেত্রে সাহায্যকারী ভূমিকা পালন করে না। সেজন্য কী জাতীয় ব্যবস্থাপনা থাকলে কার্য সম্পাদন যথাযথ হবে এবং কর্মীরা কাজে উৎসাহিত বোধ করবেন, তার ওপর কার্য সম্পাদনের গুণগত ও পরিমাণগত উভয় মানই প্রকাশ পায়।

৮.১২ কার্য-সম্পাদন পর্যালোচনার উদ্দেশ্য (Objectives of Performance Appraisal)

প্রতিটি সংগঠনেরই কিছু উদ্দেশ্য থাকে। সংগঠনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কার্য সম্পাদন পর্যালোচনা খুবই প্রয়োজন। এই পর্যালোচনার উদ্দেশ্যগুলি হল—

1. সংগঠনের কর্মীদের বাস্তব অবস্থা এবং তাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে জানা সম্ভব হয়।
2. কাজের ক্ষেত্রে কর্মীদের কোন্ কোন্ স্থানে ত্রুটি বা অযোগ্যতা রয়েছে তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

3. কর্মীদের কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য কী কী করণীয় আছে তা নির্ধারণ করা যায়।
4. কর্মীদের কাজে দক্ষতা কতখানি বৃদ্ধি পেলে সংগঠনের বিভিন্ন ব্যয় হ্রাস পাবে তা দেখানো সম্ভব হয়।
5. কর্মীদের মত প্রকাশের সুযোগ এই পর্যালোচনার মাধ্যমে সম্ভব হয়।
6. কার্য-সম্পাদন পর্যালোচনার মাধ্যমে পদোন্নতির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা সম্ভব হয়।
7. যে কর্মী শিক্ষানবিশি কাল (Probationary period) সন্তোষজনকভাবে শেষ করেন তাদের পাকাপাকিভাবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে (confirm) কার্য সম্পাদন পর্যালোচনা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে।
8. কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্য সম্পাদন পর্যালোচনা সাহায্য করে।
9. কর্মীদের বদলির ক্ষেত্রে কার্য সম্পাদন পর্যালোচনা উপযুক্ত ভূমিকা পালন করে।
10. সংগঠনে কর্মীদের আপেক্ষিক মর্যাদা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কার্য সম্পাদন পর্যালোচনা সাহায্য করে।
11. অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি বা হ্রাস করার ক্ষেত্রে কার্য সম্পাদন পর্যালোচনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
12. উপরওয়ালা এবং অধীনস্থ কর্মীর মধ্যে কীভাবে যোগসূত্র স্থাপন করা যাবে ও তাদের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ় হবে, সবই কার্য সম্পাদন পর্যালোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।
13. কর্মী ছাঁটাই করার ক্ষেত্রে যেসব কর্মী যোগ্য নয় তা বিচার করা হয়। কার্য-সম্পাদন পর্যালোচনার মাধ্যমে কর্মীদের যোগ্যতা বিচার ও তার সাথে কর্মী ছাঁটাইয়ের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।
14. কর্মীদের কর্ম সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কার্য-সম্পাদন পর্যালোচনা নির্ভরশীল। কার্য-সম্পাদন পর্যালোচনার মাধ্যমে কোন্ কর্মী কাজে বেশি সচেতন, কে সচেতন নয় তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।
15. সর্বোপরি সংগঠনের উদ্দেশ্যপূরণে এই পর্যালোচনা প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে।

৮.১৩ কার্য-সম্পাদন পর্যালোচনার গুরুত্ব (Importance of Performance Appraisal)

কর্মী ব্যবস্থাপনায় পদোন্নতি, অনুপ্রাণিতকরণ প্রভৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কার্য-সম্পাদন পর্যালোচনা প্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। কার্য-সম্পাদন পর্যালোচনার

জন্য সবচেয়ে জরুরি হল কর্মী সংক্রান্ত বিষয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া। সঠিক তথ্য কর্মী-ব্যবস্থাপককে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। যেমন, কোন্ কর্মীর প্রশিক্ষণ আবশ্যক, কার পদোন্নতি দরকার ইত্যাদি।

সুতরাং বলা যেতে পারে সঠিক কার্য-সম্পাদন পর্যালোচনা কর্মী-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি গুরত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে স্বীকৃত। নীচে এর গুরুত্বগুলি আলোচিত হল :

1. **ব্যবস্থাপকের দৃষ্টিকোণ থেকে** (From Manager's point of view) : ব্যবস্থাপকের দৃষ্টিকোণ থেকে এই পর্যালোচনা কর্মীদের যোগ্যতা ও মান বিচারে সাহায্য করে।
2. **কর্মীদের দৃষ্টিকোণ থেকে** (From Employee's point of view) : কর্মীদের দৃষ্টিকোণ থেকে এই পর্যালোচনা তাদের বর্তমান অবস্থা, কীভাবে আরও উন্নতি করা সম্ভব ও কত নিপুণতার সাথে কার্য সম্পাদন করা সম্ভব তা জানতে সাহায্য করে।
3. **প্রশিক্ষণ** (Training) : এই পর্যালোচনার মাধ্যমে কর্মীদের আরও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে কিনা তা জানা সম্ভব হয়। যদি প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে কী জাতীয় প্রশিক্ষণ কর্মীদের কাজের মানকে আরও সমৃদ্ধ করবে তা জানা যায়।
4. **সিদ্ধান্ত গ্রহণ** (Decision-making) : সংগঠনের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা কাজে রূপায়ণের জন্য কীরূপ অবস্থার প্রয়োজন তা এই পর্যালোচনার মাধ্যমে স্থির করা যায়।
5. **অযোগ্য কর্মীদের চিহ্নিতকরণ** (Pointing out inefficient employees) : এই পর্যালোচনার মাধ্যমে একেবারে অযোগ্য কর্মী চিহ্নিতকরণ ও তাদের বরখাস্ত বা অন্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।
6. **পারস্পরিক সম্পর্ক** (Relationship) : এই পর্যালোচনা সংগঠনের বিভিন্ন কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে।
7. **ব্যবস্থাপকের কাজের মান** (Standard of performance of managers) : ব্যবস্থাপকদের কাজের মান কীভাবে আরও উন্নত করা যায় তাও এই পর্যালোচনার মাধ্যমে জানা সম্ভব হয়।

৮.১৪ সারাংশ

কোনো কর্মীর ব্যক্তিগত পারদর্শিতা বা কাজ সম্পাদনের ক্ষমতা ছাড়া কোনো বিশেষ কাজ সাধারণভাবে সম্পাদন করার জন্য একজন কর্মীর যে স্বাভাবিক যোগ্যতা প্রয়োজন তা নির্ধারণ এবং তুলনা করার প্রচেষ্টা হল কর্ম-মূল্যায়ন। কর্ম-মূল্যায়নের জন্য কতকগুলি নীতি অনুসরণ করতে হয় এবং এর গুরুত্বও অসীম। যেমন কর্ম-মূল্যায়নের ফলে বিভিন্ন পদের পৃথকীকরণ করা সম্ভব, কোন্

কাজের কেমন গুরুত্ব তা নির্ধারণ করা যায় ইত্যাদি। বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে এই কর্ম-মূল্যায়ন করা হয় যেমন সনাতন পদ্ধতি ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি। কর্ম-মূল্যায়নের পাশাপাশি কর্ম-বিশ্লেষণ ও কার্য-সম্পাদন পর্যালোচনা খুবই প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানে কর্মী-নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও অনুপ্রাণিতকরণের পর তাদের কাজের পর্যালোচনা করা হয়। এই পর্যালোচনার মাধ্যমে ব্যবস্থাপক জানতে পারেন কর্মীরা কত দক্ষতার সাথে তাদের কাজ সম্পাদন করেছে। পর্যালোচনার ফলে যদি কোনো ত্রুটি দেখা যায়, তাহলে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্মীকে জানানো হয় এবং ব্যবস্থাপক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে কার্য-সম্পাদন কেমন ভাবে করতে হবে সে সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব। উপরোক্ত বিষয়গুলি এই এককে যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৮.১৫ অনুশীলনী

ক) বহুপছন্দ ভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। বিভিন্ন কাজের আপেক্ষিক গুরুত্ব বা আপেক্ষিক মূল্য, বিশ্লেষণ ও যাচাইকরণ করাকে __________ বলে।

ক) কর্ম মূল্যায়ন — খ) কর্ম বিশ্লেষণ

গ) কাজের বিবরণী — ঘ) কাজের পরিবেশ

২। কর্ম মূল্যায়নের সনাতন পদ্ধতিগুলি কী কী?

ক) মর্যাদাকরণ পদ্ধতি — খ) উপাদানের তুলনা পদ্ধতি

গ) কাজের শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি — ঘ) মাত্রা পদ্ধতি

৩। কোনো কর্মীর কর্ম সম্পাদন এবং তার উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট মূল্যায়নকে বলে—

ক) কাজের নির্দিষ্টকরণ — খ) কর্মী প্রশিক্ষণ

গ) কার্য-সম্পাদন পর্যালোচনা — ঘ) কর্মী উন্নয়ন

৪। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুযায়ী কার্য-সম্পাদনে কর্মীর অবদান মূল্যায়ন করা হল __________।

ক) কর্মী প্রশিক্ষণ — খ) কাজের মূল্য নির্ধারণ পর্যালোচনা

গ) কর্ম মূল্যায়ন — ঘ) কার্য-সম্পাদন পর্যালোচনা

৫। কাজের গুরুত্ব ও মূল্য নিম্নলিখিত কোন্‌টির উপর নির্ভর করে না?

ক) দক্ষতা — খ) দায়িত্ব

গ) কর্মীদের অর্থনৈতিক অবস্থা — ঘ) কাজের পরিবেশ

খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

১। কর্ম মূল্যায়নের সংজ্ঞা দিন।

২। কর্ম মূল্যায়নের সনাতন পদ্ধতির অন্তর্গত মর্যাদাকরণ পদ্ধতি সম্বন্ধে লিখুন।

৩। কর্ম মূল্যায়নের দুটি সুবিধা উল্লেখ করুন।

৪। কার্য-সম্পাদন পর্যালোচনা কাকে বলে?

৫। কার্য-সম্পাদন পর্যালোচনার দুটি গুরুত্ব লিখুন।

গ) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

১। কর্ম মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব আলোচনা করুন।

২। কর্ম মূল্যায়নের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা করুন।

৩। কার্য সম্পাদনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা করুন।

৪। কার্য-সম্পাদন পর্যালোচনার উদ্দেশ্যসমূহ কী কী?

৫। কর্ম মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

NOTES

NOTES